আনন্দমেলা

যাতে ছোটদের বাড়ন্ত
পা লাগসই আরাম আর
মাপসই গড়ন পায়
এমন নক্শায়
বেজায় টেঁকসই
রকমারি জুতো...
বিশেষজ্ঞদের দিয়ে
বাটায় তৈরি।
নতুন বই নতুন খাতা
তার সঙ্গে আছে বাটা
ওয়েফাইন্ডার্স ১৭
সাইজ ৯-১১,১২-১,২-৬
টা. ২৪.৯৫,
২৮.৯৫, ৩২.৯৫
মিলি ২৪
সাইজ ৫-১০
টা. ১৪.৯৫
কমেট ৭৩
সাইজ ৯-১১½,
১২-১½, ২-৫
টা. ২৩.৯৫,
২৬.৯৫, ৩০.৯৫
ওয়েফাইন্ডার্স ৫৩
সাইজ ৯-১১,
১২-১, ২-৫
টা. ২৪.৯৫,
২৮.৯৫, ৩৪.৯৫
কচি কচি পা স্বচ্ছন্দে বেড়ে
ওঠার জুতসই জুতো
Bata

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা
চৈত্র ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

গল্প কে ফার্স্ট । আশাপূর্ণা দেবী ৬
শানুর কথা । শেখর বসু ৪৪

সত্যি গল্প মানুষের ঘরে বাঘ । জয়ন্তী বসু ৪

আবিষ্কারের গল্প ইউরেকা, ইউরেকা । মঞ্জু দাশগুপ্ত ৩৪

ছড়া শঙ্খ ঘোষ ১৭

উপন্যাস রাজা হওয়ার ঝকমারি । বিমল মিত্র ২১
কাপালিকরা এখনও আছে । বিমল কর ২৬

কমিক্‌স টারজান ১৪, ১৫, ১৮, ১৯
টিনটিন/কাঁকড়া-রহস্য ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩

মজার পড়া সরস্বতীর কাণ্ড । কুন্তক ২০

বিজ্ঞান-বিচিত্রা কেন । চিন্তা কর ৪১

ছবির পাতা আঁকতে মজা ৩৭

পুরাণের গল্প থিসিউস । উমা দাশগুপ্ত ৫৪

কলকাতার কথা আমাদের কলকাতা ২৫

খেলাধুলো ফ্রি-কিকের জাদুকর শৈলেন মান্না । স্ট্রাইকার ৫০
বাংলার স্কুল-ফুটবলাররা ৪৮
বাপ কা বেটা ৪৯

নিয়মিত বিভাগ বিন্দুবিসর্গ । ইন্দ্রমিত্র ১০
ধাঁধার পাতা ১২
আচ্ছা বলো তো ১২
জাদুঘর । শ্রীপান্থ ১৩
ম্যাজিক । পি সি সরকার জুনিয়ার ১৬
ম্যাজিকের মতো ১৬
মণিমেলার খবর ৩৬
আজব চিড়িয়াখানা ৪০
মজার অঙ্ক, অঙ্কের মজা ৪১
তোমাদের পাতা ৫৩

প্রচ্ছদ-পরিচয় ॥ পোষা বাঘিনী খৈরী । কুকুর আর হরিণের সঙ্গে খেলছে, তারপর ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে । 'মানুষের ঘরে বাঘ' লেখাটা পড়ো, তাহলেই বুঝবে ব্যাপারটা কী।

সম্পাদক ॥ অশোককুমার সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

খৈরী খুব রেগে গেছে, কিন্তু
জানে না যে, যাকে সে আঁচড়াচ্ছে, সে
মোটেই তার মতো জ্যান্ত বাঘ নয়

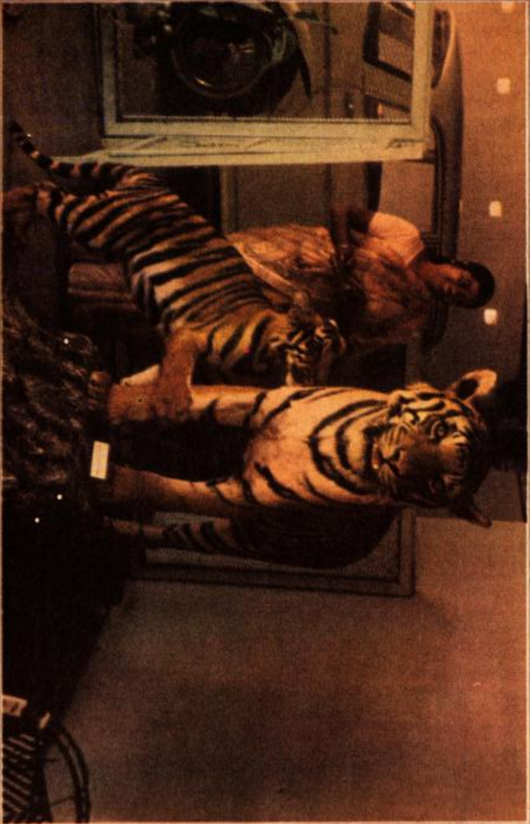

দ্যাখো, বাঘিনী খৈরীকে তার
মানুষ-মা নীহার কত যত্ন করে খাইয়ে
দিচ্ছেন

জয়ন্তী বসু

মানুষের ঘরে বাঘ

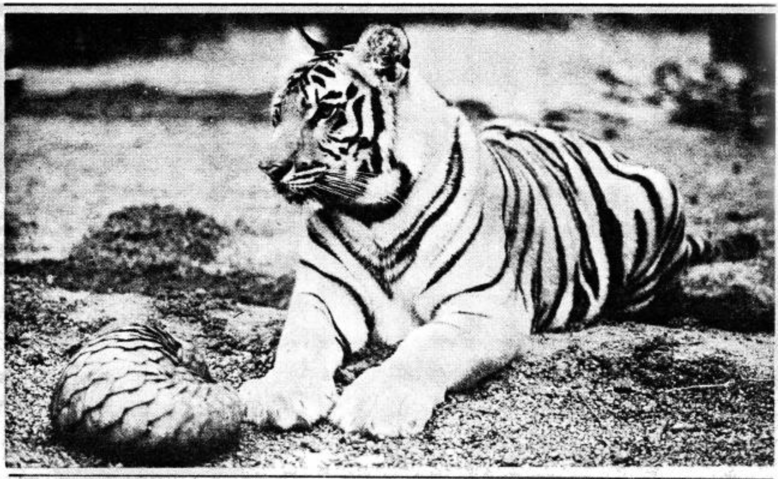

একটা বজ্রকীটকে নিয়ে খৈরী কেমন খেলা করছে, দ্যাখো

নাম খৈরী। খৈরী নদীর তীর থেকে একে পাওয়া গেছে তো, তাই এই নাম।

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার যশীপুরের ফরেস্ট বাংলোয় হরিণ, ভেড়া আর কুকুরের সঙ্গে খৈরী একেবারে বন্ধুর মতো খেলে বেড়ায়।

খৈরী কে জানো? একটা বিরাট বাঘিনী। এখন ওর বয়েস প্রায় সতেরো মাস। লম্বায় আট ফুট দু ইঞ্চি।

খৈরী যখন দু-তিন মাসের বাচ্চা, তখন কয়েকজন আদিবাসী জঙ্গল থেকে ধুনো আনতে গিয়ে ওকে দেখতে পায়। মায়ের কোলের মধ্যে ও শুয়ে ছিল। লোকজনের পায়ের শব্দে ওর মা ভয় পেয়ে ওকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মাকে পালাতে দেখে আদিবাসীরা ওকে নিয়ে আসে এবং 'সিমলিপাল প্রোজেক্ট টাইগার'-এর ডাইরেকটর শ্রীসরোজরাজ চৌধুরীর কাছে জমা করে দেয়। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ভাইঝি নীহার খৈরীকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করে বড় করে তোলে। খৈরীও নীহারকে ঠিক মায়ের মতোই ভালবাসে।

খৈরী কোনোদিন কোনোরকম দুষ্টুমি করেনি, এক-বারই শুধু মানুষ—মায়ের হাত কামড়ে দিয়েছিল। সেদিন খৈরী শোবার ঘরের মধ্যেই বাথরুম করে ফেলেছিল। ওর মা তখন ভীষণ রেগে গিয়ে ওকে চড় মারে। সঙ্গে সঙ্গে খৈরীও মায়ের হাতে দাঁত বসিয়ে দেয়। তারপরে বাংলোর আমবাগানে লুকিয়ে থাকে।

পুরো দুদিন ও আর ঘরে ফেরেনি, কিছু খায়ওনি। তিনদিনের মাথায় ও বাংলোয় ফিরে সামনের পা দুটো মানুষ-মায়ের কাঁধে তুলে মাকে খুব আদর করে। ও বোধহয় বোঝাতে চেয়েছিল : "মা, আমি আর ককখনো দুষ্টুমি করব না।" সেদিন সন্ধ্যায় খৈরী আবার কোলে বসে খুব আদর খায়।

বাংলোর চারদিকে অনেক গাছগাছালি। তার মধ্যে হরিণ, শম্বর, ভেড়া আর কুকুর ঘুরে বেড়ায়। পাশের আমবাগানে থাকে খৈরী। খেলার ইচ্ছে হলেই ও চলে যায় জালের বেড়ার ভেতর। বেচারী ভেড়া ওর পায়ের শব্দ পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। খৈরীও ওকে তাড়া করে। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছেই থেমে যায়। ভেড়া আবার পেছন ফিরে ছুটতে থাকে। মনে হয় ওরা যেন লুকোচুরি খেলছে।

কিছুক্ষণ খেলার পরে খৈরী আবার ফিরে যায় আমবাগানে।

খেলাধুলো সেরে একদিন খৈরী বাংলোর ভেতর তার মায়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে। খাবার সময় ওর মা ওকে ডেকে-ডেকে কিছুতেই তুলতে না-পেরে নিজের হাতেই ওকে খাইয়ে দেয়। আদুরে খৈরী তারপর থেকে আর কিছুতেই নিজে খাবে না। ওর মাকেই খাইয়ে দিতে হবে।

খৈরীর খুব ইচ্ছে ও হরিণ-শিশু মানিকের সঙ্গে খেলা করে। মানিক কিন্তু ওকে দেখলেই ভয় পেয়ে নীহারের কাছে চলে আসে। মানিক, বলতে গেলে, সব সময়ই বাংলোর ভেতরে ঘুরে বেড়ায়। খৈরীকে কোথাও নিয়ে যাবার দরকার হলে মানিককে আমবাগানের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সঙ্গে নীহার তখন জীপের মধ্যে বসে থাকে। মানিককে খৈরী তাড়া করলে মানিক ছুটে এসে উঠে পড়ে। ওর পেছন-পেছন খৈরীও চলে আসে জীপের মধ্যে। তখন মানিককে নামিয়ে দিয়ে জীপ চলতে শুরু করে। খৈরীকে কোথাও তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার দরকার হলে এইভাবে মানিককে কাজে লাগানো হয়।

পোষা কুকুর ব্ল্যাকি আর ব্ল্যাকির ছেলে বাঘা দুজনেই খৈরীর ছেলেবেলার বন্ধু। বাঘা সব সময় ওর কাছাকাছি থাকতে খুব ভালবাসে।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের রাস্তায় অনেকে ভিড় করে খৈরীকে দেখে। ও-ও মাঝে-মধ্যে বেড়ার কাছে গিয়ে বসে ওদের দেখা দেয়। খৈরী সারাদিন খোলা আকাশের নীচে খেলা করে, কিন্তু সন্ধে হলেই বাংলোয় ফিরে আসে। মায়ের বিছানায় ঘুমোয়।

ছ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরেই যশীপুর গ্রাম। খৈরীকে দেখার জন্য এখন অনেকেই এখানে আসছেন। তোমরাও গিয়ে দেখে এসো না।

আশাপূর্ণা দেবী

কে ফার্স্ট?

ভুল করে পানের বদলে একশো টাকার নোটখানা চিবিয়ে খেয়ে মেরে দিয়েছেন, এটা টের পেলেন দোলগোবিন্দ দফাদার 'গঙ্গালের হাটে' এসে ভুষির দাম দেবার সময়।

হাটে গোলদার হারান দাসের কাছ থেকে হাজার কথা কয়ে দরাদরি করে আটানব্বই টাকা পঁচাশি পয়সায় পাঁচ বস্তা ভুষি সওদা করে বিনোদ গাড়োয়ানের গরুর গাড়িতে বস্তাগুলো তোলাতে থাকেন দোলগোবিন্দ বেজার-বেজার মুখে। কী বাজারই হয়েছে! একটা পয়সা কমাতে চায় না কেউ, পাঁচ বস্তা ভুষির দাম কিনা আটানব্বই টাকা পঁচাশি পয়সা!

আর আগে? কী শস্তাই ছিল! পাঁচসিকেয় বস্তা। ভাবছেন, হঠাৎ চমকে উঠলেন হারানের ডাকে, "মাল তো তোলাচ্ছেন কত্তা, আমার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দ্যান?"

শুনে দোলগোবিন্দর পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়। কড়াগলায় বলেন, "তোর পাওনা টাকা নিয়ে কি আমি ভেগে পড়ছি হারান? ধার কর্জ রাখিনে আমি, এই নে—"

বলে ট্যাঁকের মোচড়পাক খুলে দামটা হারানের সামনে ফেলে দিলেন। দিতেই হারান 'হাঁ' হয়ে গিয়ে বলল, "কী এ?"

"কী এ!

তাই তো! ব্যাপারটা কী! 'হাঁ' হয়ে গেলেন দফাদারও। মানে ব্যাপার দেখে দফাটা তাঁর রফাই হয়ে গেল। দেখলেন হারানের সামনে যেটা ফেলে দিয়েছেন তিনি,

সেটা হচ্ছে কান-মোচড়ানো চামড়া-কোঁচকানো একখিলি সাজা পান। না, আট ভাঁজ করা একখানা একশো টাকার নোট নয়, ওই শুকনো পানের খিলিটাই!

ট্যাঁকের কষির মোচড়পাকের খাঁজে যেখানে একশো টাকার নোটখানার শুয়ে থাকার কথা, সেখানে ওই শুকনো-শুকনো পানের খিলিটা শুতে এল কখন সেটা বুঝতে না পেরে দফাদার থতমত খেয়ে বললেন, "তাই তো! কী এ?"

হারান দাস ভোম্বল গলায় বলল, "গরিবের সঙ্গে আপনার আবার এ কী মশকরা কত্তা-মশাই?"

দফাদার রেগে আগুন হয়ে বললেন, "তোর সঙ্গে আমি মশকরা করছি হারান? বুঝে সমঝে কথা কইতে শিখিসনি?"

হারান বলে, "শিখব না কেন কত্তা? যা ফ্যাক্টো সেটাও তো দেখতে হবে। আমি শুধোচ্ছি মানেটা কী এর?"

ততক্ষণে বিনোদ গাড়োয়ান তার খ্যাঁদা নাকটি বাড়িয়ে "মানে"র গন্ধ শুঁকতে এসেছে. আর তার সঙ্গে হাটের এ-খাঁজ ও-খাঁজ থেকে নাক চলে আসছে কোনো একটি গোলমেলে গন্ধের আশায়।

দোলগোবিন্দ বিহ্বল গলায় বলেন, "মানে তো আমিই শুধোচ্ছি তোমায় হারান! বলি ট্যাঁক থেকে নোটটাই বা গেল কোথায়, আর পানের খিলিটাই বা এল কোথা থেকে?"

হারান বেজারস্য বেজার মুখে বলে, "এতকাল গোলদারী ব্যাবসা করছি কত্তা, এই মঙ্গলের হাটে এসে বেচাকেনাও করছি, ভুষিমালের কারবারও করে আসছি জ্ঞান অবধি, কিন্তু পানের খিলি দিয়ে দাম শুধতে তো দেখিনি কাউকে।"

দফাদার অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, "পানের খিলি দিয়ে তোর ভুষির দাম শুধতে এসেছি আমি? নোট-খানা কোথায় হাওয়া হয়ে গেল আর পানটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল, সেটাই চিন্তা করছি।"

হারান দাস বলে, "তা আজ্ঞে করুন চিন্তে, বিনোদ তুই ততক্ষণ বস্তাগুলো গুনতি করে নামিয়ে ফের আমার চালার তলায় বসিয়ে দে ঠিক যেমনটি ছেলো।"

হারানের ওই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে দোলগোবিন্দর মুখখানা বনবিড়ালের মত, আর মেজাজটা নিম-পাতার মতন, হয়ে গেল। কিন্তু—বলতে তো পারেন না, 'খবরদার বিনোদ, বস্তা নামাবি না, নামালে তোর হাড়-মাস আলাদা করে ছাড়ব।'

হ্যাঁ, মেজাজটা দোলগোবিন্দর ওই রকমই। কথায় কথায় তিনি লোকের হাড়মাস আলাদা করেন, মাথা গুঁড়িয়ে ছাতু করেন, পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেন, নাক কান কেটে টিকটিকিকে দিয়ে খাওয়ান, ঠেঙিয়ে 'বিন্দাবন' দেখিয়ে দেন, ছুঁচোবাজি হেন চর্কিপাক খাইয়ে ছাড়েন। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা।

এখন হারান দাস সেই কান-মোচড়ানো গাল-তোব-ড়ানো পানের খিলিটাকে হাতের তালুতে রেখে সেই হাতটাকে টর্চবাতি ঘোরানোর মতন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাটসুদ্ধু লোককে দেখাচ্ছে, "দেখুন ভাই সবাই, দফাদার মশাই আমায় পাঁচ বস্তা ভুষির দাম দেছেন।·একশত টাকার লোট।"

বলছে, আর দাঁত বার করে হাসছে।

শুনতে শুনতে দোলগোবিন্দর মুখটা বনবেড়ালের মতন থেকে ক্রমশ মেছো কুমিরের মতন হয়ে উঠছে। ঠিক এই সময় আলুওলা গগন গড়াই নাকের সঙ্গে মুখটাও এগিয়ে এনে বলে, "আচ্ছা দফাদার মশাই, নোটখান নিয্যস এনেছিলেন তো? না কি ঘরেই ফেলে এসে-ছিলেন, ভাবুন তো জম্পেস করে।"

দফাদার আগুন গলায় বলেন, "এর আবার জম্পেস করে ভাববার কী আছে হে গড়াই? মাল সওদা করতে হাটে আসব আর টাকা আনব না? একশো টাকার নোট-খানা ক্যাশবাক্স থেকে বার করে—মা কালীর ছবির চরণে ছুঁইয়ে কপালে ঠেকিয়ে-ট্যাঁকে নিলাম, তখন ভজ পিছু ডাকল। ওই পিছু-ডাকই সর্বনাশের গোড়া। তা তখন ভজ পিছু ডেকে বলল, 'বাবা, মা বলল, সাত সকালে এক-ধামা গুড়মুড়ি গিলে পাঁচ সাত মাইল হাঁটতে বেরোচ্ছ, এই নুন-জোয়ান দেওয়া পানটা খেয়ে নাও, নচেৎ অম্বল উঠবে।' ওই নুন-জোয়ানের পান আমার দুচক্ষের বিষ, তবু দেরির ভয়ে তক্কাতক্কি না করে, পানটা গালে ফেলে কোমরের কষি শক্ত করে বেরিয়ে এলাম চটপট।"

"বেরিয়ে এলেন চটপট?"

গগন গড়াইয়ের মুখে একটি অলৌকিক হাসি ফুটে ওঠে, তবু সেটা চেপে টিপে-টিপে বলে, "লোটটা ট্যাঁকে রাখলেন, পানটা মুখে ফেললেন, বেরিয়ে এলেন চটপট, কেমন?"

দোলগোবিন্দ বেশ বোঝেন, সুবিধে পেয়ে এরা তাঁকে নিয়ে মজা দেখছে। রাগে তোৎলা হয়ে ওঠেন দোলগোবিন্দ. বলেন, "তা—তা—তাইতো। এ নিয়ে অ্যা—অ্যা—অ্যাতো জে—জেরার কী আছে শু—শুনি?"

"আহাহা জেরা কিসের? আপনি একটা মান্যমান ব্যক্তি, আপনাকে জেরা করবে গগন গড়াই? শুধু শুধোচ্ছি পানটা তাহলে ঠিক ওই যাত্রাকালেই গালে ফেলেছিলেন?"

দোলগোবিন্দ তাকিয়ে দেখেন, হাটসুদ্ধু লোক তাঁর দিকেই তাকিয়ে, আর বিনোদ গাড়োয়ান ভুষির বস্তা গুলো নামিয়ে নামিয়ে হারানের চালায় ঢোকাচ্ছে। এই অপমান আজ বরদাস্ত করতে হল দোলগোবিন্দকে শুধু একটা ভুতুড়ে কাণ্ডয়।

ইচ্ছে হচ্ছে হাটসুদ্ধু সবাইকে নাকে নস্যি দিয়ে হাঁচান, চোখে লঙ্কা দিয়ে কাঁদান, সিদ্ধির সরবত খাইয়ে হাসান। আর ওই হারানটাকে?

ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে, কী ইচ্ছে করছে ভাববার আগেই গগন গড়াই নিরীহ গলায় বলে, "তা পানটা আজ্ঞে ভালই খেয়েছিলেন তো? বেশ মিঠে-মিঠে, নুন ঝাল? যেমনটি রোজ খান?"

এ-কথার মানে? পানটা যে দোলগোবিন্দর বিচ্ছিরি লেগেছিল, একথা ও জানল কী করে?

তবু চড়াগলায় বললেন, "সেই অবধি পান-পান করে মাথা ঘামাচ্ছ কেন হে গগন? বলি পানটা আমার পানের মতন লেগেছিল কি কাঠ-খড়-কাগজ-শালপাতার মতন লেগেছিল, তাতে তোমার কী আসছে যাচ্ছে?"

গগন গড়াই অমায়িক গলায় বলে, "আমার কিছুই আসছে না দফাদার মশাই, আপনার যাচ্ছে এই একশো টাকার লোটখানা। ধরুন তাড়াতাড়িতে আপনি, মানে ভুলক্রমে আরকি! সেবার যেমন লাঠিগাছটাকে বিছানায় শুইয়ে নিজে সারারাত ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থেকে-

ছিলেন।"

"অ্যাঁ।"

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের শলা দফাদারের মগজ-টাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায়।

সর্বনাশ!

এই কাণ্ড করে বসেছেন তিনি?

ঠিক ঠিক। করেই বসেছেন। তাই পানটা মুখে ফেলা পর্যন্ত মেজাজটা বোদা হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল পান খাচ্ছি না, কাগজ খাচ্ছি।

তার মানে কাগজই খাচ্ছিলেন।

সেই আট-ভাঁজ-করা ময়লা কাগজখানা। চিবোচ্ছেন আর চিবোচ্ছেন, রস আর বার করতে পারছেন না।

হায়! হায়!

আর তিনি কিনা তখন মনে মনে ভজর মার মুণ্ডু-টাকেও চিবোচ্ছিলেন, একটা বাসী পান গছিয়েছে বলে।

দোলগোবিন্দ প্যাঁচার মত মুখে, গলা নামিয়ে বলেন, "চেপে যা গগন!"

গগন গড়াই বলে, "তা আর বলতে।"

কিন্তু রহস্যটা তো সকলের কাছে ভেদ হয়নি। তাই সবাই নাক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে, "ব্যাপারটা কী হল গড়াই মশাই? ব্যাপারটা কী হল?"

গগন গড়াই একটা চোখ টিপে বড় গলায় বলে, "কিচ্ছু না কিচ্ছু না। সামান্য এদিক-ওদিকের ব্যাপার। যান দফাদার মশাই, ঘরে যান। সামনের হাটে মাল তুল-বেন।...যাও যাও ভাই, তোমরা নিজ নিজ কাজে যাও!"

দোলগোবিন্দ তাঁর ঐতিহাসিক ছাতাটি বগলে চেপে সাঁ করে উল্টো মুখে মুখ ঘুরিয়ে গটগট করে এগিয়ে গেলেন মনে-মনে নিজের গালে-মুখে চড়াতে চড়াতে।

উঃ! এই অপকর্মটি যদি বোঁচা করে বসত? নির্ঘাত তাঁর এই নতুন ছাতাটি তার পিঠে ভাঙতেন। 'পাগলে কী না কয়, আর ছাগলে কী না খায়' বলে ছেড়ে দিতেন না।

ছাতাটা অবশ্য দোলগোবিন্দর বাবা রাসগোবিন্দর দরুন, কিন্তু দু দুবার ওর বাঁট বদলানো হয়েছে, আড়াই-বার শিক, আর বার তিনেক কাপড় পাল্টানো হয়েছে। এতেও যদি 'নতুন' বলা না হয় তো কিসে হবে? তবু ওটাই বোঁচার পিঠে ভাঙতেন দোলগোবিন্দ, যদি বোঁচা এই অকর্মটি করে বসত।

সেবার যখন ক্যালেণ্ডারের রাধাকৃষ্ণর ছবিখানা চিবিয়ে মেরে দিয়েছিল বোঁচা, ভাঙেননি দোলগোবিন্দ তার পিঠে আস্ত ছাতাটা?

দ্বিতীয়বার বাঁট বদলের কারণটাই তো তাই।

দোলগোবিন্দর ইচ্ছে হল নিজেকে বোঁচার জায়গায় দাঁড় করিয়ে ছাতাটা উঁচিয়ে ধাঁই ধাঁই পিটোতে থাকেন, যতক্ষণ না ভাঙে। ধাঁই পটাপট, ধাঁই পটাপট!

কিন্তু সত্যি কি আর নিজেকে ছাতা পেটানো যায়? যায় না, তাই ছাতাটাকে বগলে চেপে বাড়িই ফিরতে গেলেন।

গেলেন, তবে যাওয়া হল না। খানিকটা গিয়ে মনটা হঠাৎ ঘুরে গেল। দুর ছাই কী হবে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে? ঘোড়েল গগন গড়াই তখন ভালমানুষটি সাজলেও দোল-গোবিন্দর এই লোকহাসানো কীর্তির কথা নিয়ে ঢাক পেটাতে বাকি রেখেছে নাকি? দু-চাকার গাড়িতে চড়ে রাজ্যি জয় করে বেড়ায়, কখন পৌঁছে গেছে।

একবার বুক ফুলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন, বলেছে তো বলেছে, এত ভয়টা কী? নিজের নোট খেয়েছি বই তো অপরের খেতে যাইনি। কিন্তু ভাবতে জোর পেলেন না। সব থেকে ভয় ওই গিন্নীটিকে। ভজগোবি-ন্দর উপযুক্ত জননী।

শুনতে যা দেরি, এ-কুলের ও-কুলের তিনকুলের সক্কলকে ডেকে-ডেকে বলবে আরো রংচং মিশিয়ে।... বলি ভুল তো মানুষেরই হয়। পশুপক্ষী তো ভুল করতে যায় না? তা সে-কথা বুঝবে না, তিলকে তাল করে তুলবে।

এই তো কবে যেন একদিন দোলগোবিন্দ কুলুঙ্গির ভেতরে পড়ে-থাকা টেঁপির কানফুল জোড়াটাকে সুপুরির ভুসো ভেবে গালে ফেলে চিবিয়ে ফেলেছিলেন! এই সামান্যকে নিয়ে কী কাণ্ডই না করে বেড়ালো!

মেয়ের দোষটি কেউ দেখল না।

যত দোষ নন্দ ঘোষ দোলগোবিন্দর।

কেন, মেয়ে কেন সেইখানেই ফুলজোড়াটি রাখতে গেছল, বাবা যেখানে সুপুরির কৌটো রাখে?

পৃথিবীতে আর জায়গা ছিল না?

ঘুঁটের মাচা নেই?

কয়লার বস্তা নেই?

গোয়াল নেই?

ঢেঁকিঘর নেই?

বাবার জায়গাটিতেই দরকার?

দোলগোবিন্দ গোছানো মানুষ, অতশতর কী জানেন? ভেবেছেন, কৌটোয় রাখতে ধারেপাশে ছড়িয়ে পড়ে যাওয়া এই সুপুরি-কুচো, এগুলোই আগে শেষ করি।

হায়, কে জানত, তারাই শেষ করবে দোলগোবিন্দকে। কানফুলের সেই খোঁচা কোণ মাড়িতে ফুটে গিয়ে দোল-গোবিন্দর গাল ফুলে কুমড়ো! বড় ডাক্তারের চিমটেয় সেই সোনার খোঁচা বেরোল।

তবু লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে কিনা বেদরদে পাড়াসুদ্ধু সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, "বাবা না...হিহি...সুপুরি ভেবে ...হিহি...আমার কানের ফুল দুটোকে মুখে ফেলে... হিহিহিহি হিহি হিহি···চিবিয়ে চিবিয়ে না...হিহি···গাল ফুলিয়ে হিহি—"

আর তারপর ও কিনা নতুন একজোড়া কানফুল আদায় করে ছেড়েছে। এই পৃথিবী!

আর সেবার টেঁপির মার মোটা গোট-হারটাকে কুকুর বাঁধা পেতলের চেন ভেবে বোঁচাকে বাঁধতে গিয়ে?

নাঃ, সে-কথা আর মনে না-আনাই ভাল। তুমি সোনার হার ছড়াটাকে আলনায় দুলিয়ে রেখে চান করতে গেছ, এ-কথা কে বুঝবে?

দুর, দুনিয়ায় কেউ কারো নয়। এ সংসার ত্যাগ করাই উচিত।

কিন্তু উচিত বললেই তো হল না?

ত্যাগ করার উপায় কোথায়?

আসছে মঙ্গলবারে আবার ওই শেয়ালমুখো হারান দাসের কাছ থেকে পাঁচ বস্তা ভুষি কিনতে হবে না? বর্ষার আগে গোয়ালের চাল ছাইতে হবে না? টেঁপির বিয়ের জন্যে পাত্তর দেখতে হবে না তোড়জোড় করে? কাজের কি শেষ আছে? এসব সমাধা করে তুলে, তবে না সংসার ত্যাগ? তার চেয়ে বরং একবার বটু ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে দেখলে হয়, "ডাক্তার, তোমাদের শাস্তরে এই ভ্রান্তিরোগের

কোনো দাওয়াই আছে? বড়ি, গুলি, জলগোলা, যা হোক—"

ডাক্তারের বাড়ির পথে মোচড় খেয়েছেন, আর দেখেন প্রাণের বন্ধু পতিতপাবন আসছে হনহনিয়ে। পতিতপাবনের তিব্বতী লামার মত লতানে গোঁফজোড়াটি কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত খোঁচা হয়ে উঠেছে, আর গায়ের লোমগুলো আলপিনের আগার মত।

দোলগোবিন্দকে দেখেই পতিত চিৎকার করে ওঠে, "এই যে দোলু, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। বলি, আমার ছাগল যদি আমি ল্যাজে কাটি, তাতে কার কী?"

দোলগোবিন্দ এই রণমূর্তি দেখে তাড়াতাড়ি বলেন, "কারোর কিচ্ছু না।"

"আমি যদি ছাগলের দামে গরু বেচি, কার কী?"

দোলগোবিন্দ আবার বলে ওঠেন, "কিচ্ছু না।"

পতিতপাবন ফুসতে ফুসতে বলে, "তবে? তবে গিন্নী কেন বলছে, আমি নাকি গাঁজা ধরেছি। বলছে দোলগোবিন্দ দফাদারের সঙ্গে মিশেমিশেই আমার এই দফাগয়া দশা হয়েছে।"

নিজের নাম শুনে দোলগোবিন্দ রেগে উঠে বলেন, "আমার কথা উঠছে কেন? আমার কথা উঠছে কেন?"

"ওই তো, বলে কে। একটু এদিক ওদিক হলেই নানান কথা তুলবে।"

দোলগোবিন্দ একটু গুম্ হয়ে গিয়ে বলেন, "তা বর্তমানে কোন্ এদিক-ওদিকটা হল?"

পতিতপাবন উড়িয়ে দিয়ে বলে, "কিস্সুই না। গেল শনিবারের হাটে বশির শেখের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার একটা ছাগল ওকে বেচব। দেড়কুড়ি টাকা দরও দিয়েছিল। আর বলেছিল ছাগলটা যেন বেশ পুরুষ্ট হয়। সেই কথামত নিয়ে গেছি একটাকে বেছেগুছে—" পতিতপাবন এখন একটু মাথা চুলকে বলে, "খেয়াল করিনি সেটা আমার কালো গাইটা।"

"অ্যাঁ।"

দোলগোবিন্দ তাঁর বিরাট বপুখানি নিয়েও প্রায় আধহাত লাফিয়ে উঠে বলেন, "বল কী হে পতিতপাবন? অ্যাঁ? ছাগল বলে তুমি কালো গাইটাকে!!! হা হা হা। তুমি যে আমাকেও হারালে।...তা বলি, বশির কিছু বলল না?"

পতিতপাবন আরো মাথা চুলকোয়। পতিতের গোঁফজোড়াটা আবার তিব্বতী লামার মতন লতিয়ে যায়, পতিতপাবন কাঁচুমাচু মুখে বলে, "মিথ্যে বলব না ভাই, বলেছিল। দেখেই বলেছিল, এটা কী আনলেন ঘোষমশাই?...আমিই রেগেমেগে বললাম 'দেখতে পাচ্ছিস না কী আনলাম? চোখ নেই? কানা? যেমন বলেছিলি পুরুষ্টু দেখে আনতে, তেমনি সবসেরা ছাগলটাই নিয়ে এসেছি।'...তা ও ব্যাটা আমার সঙ্গে চালাকি খেলল। কোথায় বলবে, 'ঘোষমশাই, ছাগল কোথা? এটা যে গরু!' তাহলে আমার খেয়ালে আসে। তা নয়, মিটিমিটি হেসে বলল কিনা, 'কী খাইয়ে এতখানিটি করে তুলেছেন ঘোষ মশাই?' আমারও রাগ উঠে গেল, বললাম, 'তোর মতন নই রে বশির যে, পোষা প্রাণীকে শুধু মাঠে ছেড়ে দিয়েই কর্তব্যে খালাশ হব। দস্তুরমত খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি।' শুনে-না ফ্যাকফাক করে হেসে, সেলাম ঠুকে চলে গেল। তারপর ভাই বাড়ি ফিরে যা হবার তাই। দেখি গিন্নী উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে। বুক চাপড়াচ্ছে। আমায় দেখে মাথা ঠুকতে বসল, 'ছাগলের বদলে তুমি বুধিকে হাটে বেচে দিয়ে এলে! দিনে তিন চার সের করে দুধ দিচ্ছিল বুধি।'"

"ঈস!"

দোলগোবিন্দ বলেন, "তা তুমি গিয়ে বললে না বশিরকে?"

পতিতপাবন বলে, "বলিনি আবার? সেই শনি থেকে এই মঙ্গল—এই তিনচারদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে জ্বতোর তলা ক্ষয়ে গেল। তা মানতে চায় না ব্যাটা। হেসে হেসে বলে, 'আপনি বেচলেন ছাগল, আমি কিনলাম ছাগল, এর মধ্যে গর্ব্ব আসে কোথা থেকে ঘোষমশাই?'...তা রেগে টেগে ভাবলাম, চুলোয় যাক। ভুলটা যখন আমারই, লোকসানটা আমারই হবে। কিন্তু এদিকে গিন্নী থেকে, ছেলেরা থেকে, পড়শীরা পর্যন্ত গঞ্জনা দিয়ে দিয়ে আমায় তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না ভাই। তাই এখন আমিও মেজাজ ধরেছি, বলি, আমার গর্ব্ব আমি ছাগলের দামে ছাড়ব, তাতে লোকের কী?"

দোলগোবিন্দ উদাস ভাবে বলেন, "সেই তো মজা। সংসারের নিয়মই এই! লোকের কিছ্ব না, তব্ব লোকে —তা নইলে আর আমি পান বলে ভুল করে একশো টাকার নোটখানা খেয়ে ফেলে, বাড়িপানে না গিয়ে ডাক্তার-বাড়ির পানে ছ্বটছি কেন?"

"অ্যাঁ, কী বললে?" পতিতপাবন স্থির চক্ষে কিছ্বক্ষণ বন্ধ্বকে—যাকে বলে—অবলোকন করে, হঠাৎ হাসতে শ্বর্ব করে। হা হা হা! হাসি আর থামেই না।

তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, "চলো চলো, তোমায় আমার গিন্নীর কাছে নিয়ে যাই। দেখি কাকে ফার্স্টো করে—"

দোলগোবিন্দ বলেন, "তার আগে তোমাকে আমার গিন্নীর কাছে—"

"উঁহ্ব আগে তোমায় আমি—"

"উঁহ্ব আগে তোমায় আমি—"

"না না, আগে তোমায়—"

"আরে না না, আগে তোমায়—"

"বলছি আগে তোমায়—"

"বলছি আগে তোমায়—"

দ্বই বন্ধ্বতে দ্বজনার হাত ধরে টাগ্ অব ওয়ার চালাতে থাকে। কেউ কাউকে একচুল নড়াতে পারে না। কারণ দ্বজনেই সমান বলশালী।...দোলগোবিন্দ যেমন একধামা ম্বড়ি-গ্বড়ে ব্রেকফাস্ট সারেন, পতিতপাবন তেমনি সারে এক গামলা ন্বন পান্তোয়।

সারাদিন ওই রেটেই আহারাদি চলে, কাজেই কে যে কাকে আগে গিন্নীর কাছে ধরে নিয়ে যেতে পারবে, বলা শক্ত। অতএব কে ফার্স্ট হবে তাও এখন বলা যাবে না। পারো যদি তোমরাই বলো।

ছবি এঁকেছেন ॥ স্বধীর মৈত্র

বিন্দু বিসর্গ

অশ্বিনীকুমারের বাড়ি বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে। তাঁর জন্মদিন ১৮৫৬ সালের ২৫ জান্বয়ারি। বাবার নাম ব্রজমোহন দত্ত, মায়ের নাম প্রসন্নময়ী দেবী। অশ্বিনীকুমার ১৮৭৯ সালে এম-এ ও ১৮৮০ সালে বি-এল পাশ করেছেন। ১৮৮০ সালেই বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করে দিয়েছেন। তার আগে কিছ্বদিন ছিলেন শ্রীরামপ্বরের কাছে চাতরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক। ওকালতিও বেশী দিন ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছেন। নানাভাবে দেশের সেবা করেছেন। ১৯২৩ সালের ৮ নভেম্বর মারা গেছেন।

লোকে ঠাট্টা করে বলত—অশ্বিনী দত্তের হোটেল।

অনেক লোকের আস্তানা অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে, সেদিক থেকে 'হোটেল' বলা চলে বইকী।

প্রত্যেকেরই ধারণা, বাব্ব আমাকেই বেশী ভালোবাসেন।

অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে কারও অযত্ন হওয়ার উপায় নেই। খ্বব দীনহীন মান্বষকেও অশ্বিনীকুমার মর্যাদা দিয়েছেন। সংসারে কোথাও যাদের কেউ দাম দেয়নি, তাদেরই কেউ-কেউ অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে এক তক্তাপোশে বসে গল্প করছে, কেউ-কেউ অশ্বিনীকুমারকে 'দোস্ত' বলে ডেকেছে। আরও এক ডিগ্রী উপরে গিয়েছে কেউ-কেউ। আবদার করে ধমকে অশ্বিনীকুমারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গিয়েছে।

একই সময়ে একবার একজন পাগল আর একজন সন্ন্যাসী এল অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে। সন্ন্যাসীর গের্বয়া দেখে আর কীর্তন শ্বনে পাগল চটে গেল। বলল, "এ একটা মস্ত পাগলের আড্ডা। এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়।"

সন্ন্যাসীও পাগলকে দেখে খ্বশি হয়নি। সে অশ্বিনীকুমারকে বলল, "এসব লোককে জায়গা দেওয়া কেন?"

অশ্বিনীকুমার হেসে বললেন, "এ-বাড়িটা একটা চিড়িয়াখানা। আমার মাথায়ও একট্ব ছিট আছে। তাই এখানে থাকতেই ভালোবাসি।"

লোকনিন্দা গ্রাহ্য করতেন না অশ্বিনীকুমার। লোক-নিন্দা হলে বলতেন, আচ্ছা, একট্ব হোক, তাতে ক্ষতি কী।

অশ্বিনীকুমার আনন্দময় প্বর্বষ। কোনও দ্বঃখকষ্ট বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে। অনেকদিন রোগশয্যায় শ্বয়ে আছেন। কিন্তু সেজন্য কোনও আক্ষেপ নেই, কোনও নালিশ নেই। বলতেন, সাতষট্টি বছর তো বেশ কেটেছে। এক বছর শ্বয়ে থাকার জন্য নালিশ কিসের?

'ভক্তিযোগ' আর 'কর্মযোগ' নামে দ্বখানা বই লিখেছেন অশ্বিনীকুমার। জ্ঞানীগ্বণীরা একবাক্যে 'ভক্তি-যোগ' আর 'কর্মযোগে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

দার্বণ অস্বখের পর যখন কথাবার্তায় গোলমাল করে ফেলতেন, নিজেই হেসে কুটিকুটি হতেন। বলতেন, ভক্তিযোগ হয়ে গেছে, কর্মযোগও সারা, এখানকার পালা হচ্ছে গোলযোগ।

বাড়ির চাকর সেরকয়েক চাল চুরি করেছে। কিন্তু সারতে পারেনি। ধরা পড়ে গেছে। পরামর্শ করে বাড়ির লোকজন অশ্বিনীকুমারকে বলল, ওকে প্বলিসে দিন।

অশ্বিনীকুমার নস্যাৎ করে দিলেন সেকথা। বললেন, ছি-ছি, আমার বাড়ির লোককে শাসন করবে অন্যে—লজ্জার কথা। আর তাতে কি ওর কোনও সম্মান থাকবে? সে হবে না, যা হয় আমরাই ওকে শাসন করে দেব।

—ইন্দ্রমিত্র

কুমুর কীর্তি

সেদিন দুপুরে না-ঘুমিয়ে কুমু বাগানে মাটি খুঁড়ছিল একমনে। তার দাদা দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

—কি করছিস রে কুমু? মাটি খুঁড়ে?

—ভূগভ্যো রেল বানাচ্ছি।

—তার মানে?

—আহা, ধেড়ে ছেলে ভূগভ্যো রেল জাননা? মাটির তলা দিয়ে রেল গাড়ি ছুটে চলে হুস্ হুস্। পৃথিবীর কত দেশে আছে। কলকাতাতেও হবে।

—তুই কি করে জানলিরে পাকা বুড়ি?

—জানি। বাবা বলেছে। ভূগভ্যো রেল হলে বাবাকে আর ভীড় ঠেলে ট্রামে বাসে উঠতে হবে না। রেলে চাপলেই হউস্ করে পৌঁছে দিয়ে যাবে স্টেশনে। রোজ কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বাবা। কি মজা হবে তখন। তাই না?

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

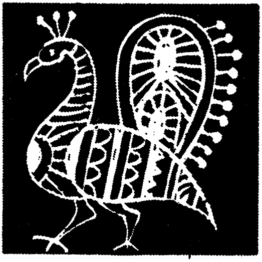

ধাঁধার পাতা

অফিসের কাজে ছোট্‌কা দিন দুই বাইরে গিয়েছিল। এ-রকমটা অবশ্য মাঝে-মাঝেই যেতে হয় ছোট্‌কাকে। আর যেখানেই যায়, আমার জন্য কিছু-না-কিছু উপহার কিনে আনবেই। তাই ছোট্‌কা ফিরলেই সব-আগে আমি দৌড়ে যাই।

সেদিন স্কুল থেকে এসে শুনি, ছোট্‌কা দুপুরেই ফিরে এসেছে। আমাকে বলেছে, দেখা করতে। বইপত্র টেবিলে রেখে, কোনওরকমে মুখে-হাতে সামান্য জলের ছিটে দিয়ে, তক্ষুনি চিলেকোঠার দিকে ভোঁ-দৌড়।

গিয়ে দেখি, ছোট্‌কা চেয়ারে হেলান দিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে নতুন একটা ডায়েরির পাতায় খসখস করে কীসব লিখে চলেছে। নির্ঘাত অফিসের কোনো জরুরী কাজ। ডাকব কি ডাকব না ভাবছি, এমন সময় ছোট্‌কা নিজেই বলল, "পাঁচ মিনিট সময় দাও সতুবাবু। হাতের কাজটা সেরে নিই। তুমি ততক্ষণ ধাঁধাগুলো টুকে নাও বরং।" ধাঁধার খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ছোট্‌কা।

একমনে খাতা থেকে নতুন ধাঁধা লিখে চলেছি। লেখা শেষ করে মুখ তুলে দেখি জলখাবার হাজির। আমার দিকে একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে নিজের প্লেটটা তুলে নিল ছোট্‌কা।

"কোথায় গিয়েছিলে ছোট্‌কা?" খেতে-খেতে আমি প্রশ্ন করি।

"কোথায় গিয়েছিলাম?" ছোট্‌কা এক-মুহূর্তে কী যেন ভেবে নিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এবারে একটা আশ্চর্য জায়গায় গিয়েছিলাম।"

"আশ্চর্য জায়গা মানে?" কৌতূহল বেড়ে ওঠে আমার।

ছোট্‌কার গলায় যেন মজা এবং রহস্য—এমনভাবে বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার, বলছি। সেখানে প্লেনে যেতে লাগল ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। আর ফিরে এলাম মাত্রই ৮০ মিনিটে।"

"প্লেনেই ফিরলে তো?" আমি বেশ বিস্মিতভাবে বলি।

"হ্যাঁ, প্লেনেই গিয়েছি, ফিরেছিও প্লেনে।"

"ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো?" আমি আপনমনে বিড়বিড় করে বলি, "এ-রকম হলো কী করে!"

"তাই তো বলছি সতুবাবু। তাহলে এটাই হোক এবারের প্রথম ধাঁধা। তুমি বসে-বসে ভাবতে থাকো, আমাকে একটু বেরুতে হবে।"

ছোট্‌কা চলে গেলে আমি ভাবতে বসি। তোমরাও একটু ভেবে দ্যাখো।

দ্বিতীয় ধাঁধা :

শেষটুকু বাদ দিলে আক্ষেপ ঝরে পড়ে,
চকিত আক্রমণ শুরু-শেষ অক্ষরে।
লেজ নেড়ে 'নয় নয়' যতই জানিয়ে দিক,
চিড়িয়াখানায় গেলে দেখা পাবে ঠিক-ঠিক।

তৃতীয় ধাঁধা : এখন থেকে তিন বছর পর আমার যা বয়স হবে, তাকে তিন দিয়ে গুণ করে, তা থেকে আমার তিন বছর আগের বয়স তিনগুণ করে বিয়োগ দিলেই আমার এখনকার বয়স জানতে পারবে। তাহলে আমার বয়স এখন কত?

চতুর্থ ধাঁধা : একটা ঠিক মাপের ইঁটের ওজন ৪ কিলোগ্রাম। একই জিনিস দিয়ে তৈরী, এর সিকি মাপের একটা ছোট ইঁটের ওজন কত হবে?

গতবারের ধাঁধার উত্তর। (১) নন্দী (২) নগর (৩) ১২, ২০, ৪, ৬৪ (৪) প্রতিটি বাক্সেই ভুল লেবেল—এই সূত্র ধরেই এগোতে হবে। 'সাদা-কালো' লেখা বাক্স থেকেই একটা বল তোমাকে তুলতে হবে। ধরা যাক, কে-বলটি পেলে সেটির রঙ কালো। তাহলে নিশ্চিত বুঝতে হবে যে, বাক্সের মধ্যের অন্য বলটির রঙও কালো (না হলে তো ঠিক লেবেল হয়ে যায়)। এই বাক্সে দুটি কালো বল আছে জানার পর, 'সাদা-সাদা' লেখা বাক্সটির মধ্যে কী আছে বলতে পারছ। কেননা, দুটি সাদা বল এই বাক্সে থাকতে পারে না, আবার দুটি কালো বলও যে নেই তুমি জেনে ফেলেছ। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্সটিতে রয়েছে একটি সাদা ও একটি কালো বল। 'কালো-কালো' লেবেল-আঁটা তৃতীয় বাক্সটিতে, সুতরাং, দুটি সাদা বল থাকবে।

'সাদা-কালো' লেখা বাক্সটি থেকে পাওয়া বলটির রঙ সাদা হলে একইরকমভাবে যুক্তি ধরে এগিয়ে অন্য বাক্সগুলির ভেতরের বলের রঙ বার করা যায়।

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো

প্রঃ কীরে খোকন, খোঁড়াচ্ছিস কেন? পায়ে ব্যথা নাকি?
উঃ হবে না? সকাল থেকে যা পড়ছি।

প্রঃ কোন পাহাড় ভদ্রমহিলা?
উঃ নন্দাদেবী।

প্রঃ কোন কাকা পাহাড়ের মাথা?
উঃ টিটিকাকা। (দক্ষিণ আমেরিকার হ্রদ)

প্রঃ কোন দ্বীপ বর্ণপরিচয়ে আছে?
উঃ বদ্বীপ।

প্রঃ জলের মধ্যে দিয়ে যায় তবু ভেজে না কী?
উঃ রোদ।

প্রঃ যে-মেয়েটির নাম সরোবরশোভাকরপ্রফুল্লকমলিনী, তার বোনের নাম কী?
উঃ লবঙ্গললিতলতাবনফুলবাসিনী

প্রঃ রাত্তিরবেলা মা খাবার কথা বলতেই রুমানি দৌড়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারল কেন?
উঃ সূর্য উঠেছে কিনা দেখতে; মা বলেছিলেন সকাল-সকাল খেয়ে নাও।

প্রঃ কার দাঁত নেই তবু কামড়ায়?
উঃ পেট।

প্রঃ মিঃ বকশীর ছেলেটা একশো সেণ্টিমিটার লম্বা হবে না কেন?
উঃ তাহলে ও হয়ে যাবে মিঃ মিটার।

প্রঃ কোন জঙ্গল চমৎকার?
উঃ সুন্দরবন।

প্রঃ কোন জায়গা দিয়ে দাঁত মাজে?
উঃ দাঁতন।

প্রঃ ইঁদুরকলটা কি আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবেন?
উঃ আপনি কি ভাবছেন আমি ইঁদুরদের এখানে পাঠিয়ে দেব?

প্রঃ কোন জায়গায় নৃপতিরা আহার করেন?
উঃ রাজাভাতখাওয়া।

ভানুমতী

জাদুঘর

সাধারণ একটা টেবিল। যে-কোনও অফিসে এমন টেবিল মেলাই আছে। আছে অনেক বাড়িতেও। তবু ঠিক এই টেবিলটি কিন্তু কোথাও তোমরা খুঁজে পাবে না। অবশ্য একটি জায়গা ছাড়া। কারণ, এটি সাধারণ হয়েও

এক অসাধারণ টেবিল।

বন্দেমাতরম গান শুনেছ নিশ্চয়ই। সেই যে—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্! আমাদের দু'টি জাতীয় সঙ্গীত। এক রবীন্দ্রনাথের—জনগণমন অধিনায়ক জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা। আর এক বঙ্কিমচন্দ্রের এই বন্দেমাতরম্। গান না-শুনলেও নিশ্চয়ই শুনেছ বন্দেমাতরম্ স্লোগান। এক সময় শত শত বীর তরুণ তরুণী এই ধ্বনি তুলে জেলে গেছেন। আমাদের দেশ তখন ইংরেজদের দখলে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তারা মোটে সইতে পারত না। শুনলেই হুকুম—পাকড়াও ওদের! কেউ কেউ ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে বন্দে-মাতরম্ বলতে বলতে। ধ্বনি নয়তো, মন্ত্র যেন। এখনও মাঝে মাঝে মিছিলে শোনা যায় ওই মন্ত্র—বন্দে-মা-ত-রম্!

গানটা দেশকে ভালবাসার গান। প্রথম কে গেয়ে-ছিলেন জানো? এক সন্ন্যাসী। নাম তাঁর—ভবানন্দ। তাঁর কথা জানতে হলে পড়তে হবে—আনন্দমঠ। আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বিখ্যাত একখানা বই। সে-বই নিয়ে এককালে সে কী হৈ-হৈ রৈ-রৈ। একদিন তোমরাও পড়বে নিশ্চয়। তার পাতায়ই রয়েছে পুরো বন্দেমাতরম্ গানটা।

আসলে এই গানটা কিন্তু 'আনন্দমঠে' ঠাঁই পেয়েছে অনেক পরে। বঙ্কিমচন্দ্র এটি লিখেছিলেন আনন্দমঠ লেখার অন্তত সাত বছর আগে। এবং লিখেছিলেন হঠাৎ। কী করে বন্দেমাতরম্ লেখা হল সে-গল্প শুনিয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তখন একটি মাসিক পত্রিকা বের করেছেন। নাম—বঙ্গদর্শন। সেকালের বিখ্যাত কাগজ এটি। কাগজ ছাপতে গেলে অনেক সময় জায়গা ভরাবার জন্য চট্ করে কিছু লেখার দরকার হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এটা সেটা লিখে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে দিতেন। আর তা-ই করতে গিয়ে একদিন লেখা হয়ে গেল পুরো বন্দে-মাতরম্ গানটা। গানটা টেবিলে চাপা দিয়ে তিনি বসে আছেন, এমন সময় ছাপাখানার পণ্ডিতমশাই এসে হাত বাড়ালেন। বঙ্কিম কাগজটি তুলে দিলেন তাঁর হাতে। তিনি নাকে চশমা লাগিয়ে গানটি পড়ে বললেন—মন্দ নয়। অ-ই শুনে, বুঝতেই পারছ, বঙ্কিমচন্দ্র রেগে গেলেন। তিনি কাগজটি তাঁর হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে টেবিলের দেরাজে রেখে বললেন, এটা ভাল কি মন্দ তা এখন তুমি বুঝবে না। কিছুকাল পরে বুঝবে!

শুধু ওই পণ্ডিতমশাই কেন, দেশসুদ্ধ মানুষ সত্যিই একদিন বুঝেছিল কী জাদু ওই গানে। বন্দেমাতরম্ আমাদের ঘুম ভাঙানোর গান। ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে, ওই টেবিলেই একদিন লেখা হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক গান। আর ওই দেরাজেই সাত বছর পড়ে ছিল তা হিজিবিজি লেখা কাগজের মত। টেবিলটি এখন আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

শ্রীপান্থ

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
শিগগির এসো! মাকড়শাটা সরে পড়বার আগে টারজানকে উদ্ধার করতে হবে!
না, মাভিরো, আমরা যাব না!
সোনা নিয়ে বরং ঘরে ফিরে যাই!
টারজান তো শস্য কেনার জন্য সোনা নিতে এসেছিলেন! সেটাই জরুরী!
না, মাভিরো, গর্তে নামব না! ভয় করছে!
টারজানকে বাঁচানো যাবে না!
মাকড়শা ওঁকে মেরে ফেলেছে!
তাহলে আমি একাই যাব!
সাহসী মাভিরো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে খাদের মধ্যে নামছে...
হঠাৎ...
আর তো নামা সম্ভব নয়! টারজানকে আর বাঁচানো গেল না!
মাকড়শাটাও আর নামতে পারছে না। যে সরু ফাটলে টারজান ঝুলছে, তার ধারেই সে দাঁড়িয়ে রইল!
শরীর অসাড়! সব বুঝতে পারছি, কিন্তু হাত-পা নাড়তে পারছি না!
ওদিকে...ওপোরের দিকে যাবার পথের ধারে...
ঘোড়া তো আর এগোতে পারবে না, লেডি জেন!
হ্যাঁ, কিন্তু ওপোর যে এখনও অনেক দূরে!
মনে হয় — আঃ!
দমাস্!

এর পর আঠারোর পাতায়

ম্যাজিক • জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

এবার যে ম্যাজিকটা তোমাদের শেখাবো সেটা একটা সাধারণ গতানুগতিক ম্যাজিক বলে ভাবলে কিন্তু ভুল করা হবে। এটা আসলে একটা ছোট্ট বুদ্ধির খেলা। ম্যাজিকের মধ্যে দুটো ভাগ আছে। প্রথমটা হচ্ছে জাদুকর কী করলেন বা দেখালেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে দর্শকদের মনে কী ধারণা বা প্রতিক্রিয়া হল। আমরা জাদুকররা ঐ দ্বিতীয় অংশটাকে বেশী প্রাধান্য দিই বা বেশী দরকারী বলে মনে করি। স্টেজের মধ্যে দর্শকদের সামনে কোন কৌশল অবলম্বন করে কী খেলা দেখালাম, সেটা নিশ্চয়ই দরকারী, কিন্তু তার থেকেও দরকারী হচ্ছে সেই খেলা দেখার পর দর্শকের মনে কতটা জাদু-প্রতিক্রিয়া তৈরী হল।

যে ম্যাজিকটা এবার তোমাদের শেখাচ্ছি, তার কৌশলটা নিশ্চয়ই খুব সহজ, এবং এত সহজ যে, জানবামাত্রই তোমাদের মনে হতে পারে এটা কি জমবে? কিন্তু মনে রেখো, এই খেলাটা দেখার পর দর্শকের মনে জাদু-প্রতিক্রিয়া খুব জোরালো হয়।

প্রথম থেকে শুরু করছি। জাদুকর সবার সামনে একটা কাগজের টুকরোর মধ্যে একটা-কিছু লিখলেন। তারপর সেই কাগজটা ভাঁজ করে দর্শকদের মধ্যে সব থেকে সম্মানীয় একজন কাউকে বেছে নিলেন। তাঁর হাতে সেই কাগজটা দিয়ে বললেন, "দয়া করে এটা এখন খুলবেন না। আমি যখন বলব তখন খুলে পড়বেন। যা লেখা আছে শুধু সেটাই পড়বেন এবং আমার অনুরোধ, সেই সম্পর্কে কিছু বাড়িয়ে বলবেন না বা কমিয়েও বলবেন না। আপনাকে অনুরোধ করছি, এ সম্পর্কে পরে কারো সঙ্গে

আলোচনা করবেন না। আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি, সেইজন্য আপনার সঠিক সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করি আপনি সহযোগিতা করবেন।" সেই সম্মানিত দর্শক কাগজটা হাতে নিয়ে রইলেন।

এবার জাদুকর অন্যান্যদের বললেন, "এখন আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এক ম্যাজিক দেখাবো। ঐ কাগজের মধ্যে আমি আগের থেকেই একটা-কিছু লিখে রেখেছি। কী লিখেছি আপনারা জানেন না। কিন্তু যাই লিখি না কেন আমি জানি সেটা আপনাদের খুব অবাক করে দেবে। আপনাদের মধ্যে যে-কেউ একজন এক থেকে দশ হাজারের মধ্যে যে-কোন একটা সংখ্যা বলুন, আমি আগের থেকেই জানি আপনারা কী বলবেন আর সেই অনুযায়ী সংখ্যাটা আমি ঐ কাগজে লিখে রেখেছি।" দর্শকদের মধ্য থেকে একজন বললেন, "ছ হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ।" জাদুকর বললেন, "আপনারা কি এই সংখ্যাটিই ঠিক করলেন? যদি ভাবেন আপনারা পরিবর্তন করতে চান তাহলে এখনও পরিবর্তন করতে পারেন।" দর্শকেরা বললেন, "না আমরা ঐ সংখ্যাটিই ঠিক করেছি।" জাদুকর বললেন, "আমি জানতাম আপনারা ঐ ছ হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ-ই বলবেন আর সেই অনুযায়ী আমি ঐ কাগজে লিখে রেখেছি।" জাদুকর এবার সেই সম্মানিত দর্শককে বললেন, "আপনি তো শুনলেন ওঁরা কী সংখ্যা পছন্দ করেছেন, এবার আপনি কাগজটা খুলে পড়ে বাকী সবাইকে বলুন, আমি কী লিখে রেখেছি।" সেই সম্মানিত দর্শক কাগজটাকে খুললেন, এবং পড়ে বললেন, "ঠিক আছে।"

তোমরাও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ, এটা কী করে সম্ভব? এক থেকে দশ হাজারের মধ্যে দর্শকেরা কোন্ সংখ্যা বেছে নেবেন তা জাদুকর জানবেন কী করে? নিশ্চয়ই দর্শকের মধ্যে জাদুকরের নিজের লোক আছে। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। আসল কৌশল রয়েছে ঐ কাগজটার মধ্যে। দর্শকেরা কী সংখ্যা বললেন সেটা মোটেই দরকারী নয়, তাঁরা যে-কোন সংখ্যা বলতে পারেন। জাদুকর ঐ কাগজের মধ্যে কোন সংখ্যাই লেখেননি, শুধু লিখেছিলেন, "ঠিক আছে।"

শর্ত অনুযায়ী সেই সম্মানিত দর্শক কাগজের লেখাটা পড়ে যখন বললেন, "ঠিক আছে", তখন দর্শকেরা ভাবলেন ঐ সংখ্যাটিই বোধ হয় লেখা আছে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, খেলাটা হয়ে যাবার সাথে-সাথেই কাগজের টুকরোটা গল্পের ছলে ছিঁড়ে ফেলো, তা-না-হলে সবাই কিন্তু দেখতে চাইবে।

একটু চালাকি করে দেখিও, দেখবে সব্বাই অবাক হয়ে গেছে।

ম্যাজিকের মতো পার্থসারথি চক্রবর্তী

ফুল গাছে ঝাঁঝরি করে জল দিচ্ছিল দাদুর সাথে ডিংকু। ঝাঁঝরি থেকে ঝর্ণার মতো জল যখন গাছের পাতায় আর ফুলের উপর পড়ে, তখন ডিংকুর ভারী ভালো লাগে। খুশিতে ওর মনটা নেচে ওঠে, ইচ্ছে করেই তখন সে ঝাঁঝরির জলের নীচে দু'হাত পেতে দেয়।

বাগানের কাজ হয়ে যাবার পর দাদু এমন সব মজার কান্ডকারখানা করেন, যা দেখে ছোটর দল মানে ডিংকু, বাপ্পা, বাবুল, মিঠুন, হাসুবানু, মৌ সবাই খুব অবাক হয়ে যায়।

আজকে দাদু কোথা থেকে একটা পুরোনো সাইকেলের পাম্পার জোগাড় করে এনেছেন। পাম্পারের সামনের মুখটা খুলে সেখানে তিনি লাগিয়েছেন চারপাশে-ফুটো-করা একটা রবারের গোলক। পাম্পারের ভিতর পিস্টন ঢোকানোর আগে তার মধ্যে কিছু জল ঢালা হল। এবার পিস্টনটি ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিলেন তিনি। ওরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল রবারের গোলকের সবদিকের ফুটো দিয়েই জল সর্বত্র সমানভাবে বেরুচ্ছে।

মজাটা দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান নাতি-নাতনীরা প্রবল উৎসাহে জল নিয়ে খেলা করবার জন্যে তাদের পুরানো রবারের বল জোগাড় করে আনল। বলের চারপাশে ফুটো করে তার মধ্যে জল পুরে চাপ দিতেই দেখা গেল সেই জল সবগুলো ফুটো দিয়ে সমানভাবে বেরুচ্ছে।

দাদু এবার তাঁর কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বার করলেন। ছোটরা এই বস্তুটি আগে কখনও দেখেনি। তাই ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ল ওটা দেখার জন্যে। জিনিসটা কাচের তৈরি, পাশাপাশি দুটো টিউব, একটা ছোট্ট অন্যটা বড়। দুটো টিউবকেই নীচের দিকের সরু একটা নল সংযুক্ত করে রেখেছে। দাদু কোটের অন্য আর একটা পকেট থেকে দুটো টিউবেরই গায়ে-গায়ে ফিট করে এমন দুটো কাঠের পিস্টন বার করলেন। এবার টিউব দুটো এবং সংযোজক নলটি জল দিয়ে ভর্তি করা হল। সবশেষে বড় পিস্টনের মাথায় একশো গ্রাম ওজন দিয়ে দাদু বললেন, "এই একশো গ্রাম ওজনকে কী করে টিউবের মাথার উপরে তুলবে বলো তো?"

ওদের মধ্যে হাসুবানুই বোধহয় সবচেয়ে বেশী চালাক, সে অমনি জিজ্ঞেস করে বসল, "বড় পিস্টনের তলের ক্ষেত্রফল কত?" দাদু বললেন, "বড় পিস্টনের তলের ক্ষেত্রফল দশ বর্গ সেন্টিমিটার এবং ছোট পিস্টনের তলের ক্ষেত্রফল দুই বর্গ সেন্টিমিটার।" হাসুবানু মনে মনে আঁক কষে উত্তর দিল, "ছোট পিস্টনের মাথায় মাত্র কুড়ি গ্রাম ওজন চাপালে একশো গ্রাম ওজনকে সহজেই টিউবের মাথার উপরে তোলা যাবে।" ওরা সবাই অবাক হয়ে ম্যাজিকের মত এই ভোজবাজিটা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে, তা জানতে চাইল। দাদু ওদের বুঝিয়ে দিলেন, "ছোট পিস্টনে কুড়ি গ্রাম ওজন চাপালে সেই চাপ সমানভাবে জলের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই চাপ বড় পিস্টনকে যার তলের ক্ষেত্রফল ছোট পিস্টনের পাঁচগুণ তাকে উপরের দিকে ঠেলে তুলবে। ইচ্ছা করলে এই বড় পিস্টনের মাথায় দুই কিলোগ্রাম ওজন রেখে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলা দিলেই ওটা উপরে উঠে আসবে। এটা হচ্ছে একটা হাইড্রোলিক মেশিনের মডেল। এর সাহায্যে খুব বড় ভারী গাড়ি, কারখানার পাট, তুলো ইত্যাদি খুব সহজেই তোলা যায়। ছোট পিস্টনে কত কম ওজন চাপিয়ে বড় পিস্টনের উপর রাখা কত বেশী ভারী মাল তোলা যায়। ব্যাপারটা ঠিক ম্যাজিকের মতো, নয় কি?"

শঙ্খ ঘোষের ছড়া

নন্দীগাঁয়ের গালফোলা
মস্ত একটা জাল ফেলে
ধরছিল মাছ মণ-দেড়েক।

তাই শুনে তার বন্ধুরা
দৌড়ে আসে হুংকারে,
হাঁক দিয়ে কয় "ফিস্টি চাই—

হরেক-রকম মিষ্টি চাই
আর কী খাব লিস্টি চাই
গন্ধে যে ভাই ঘুম কাড়ে!"

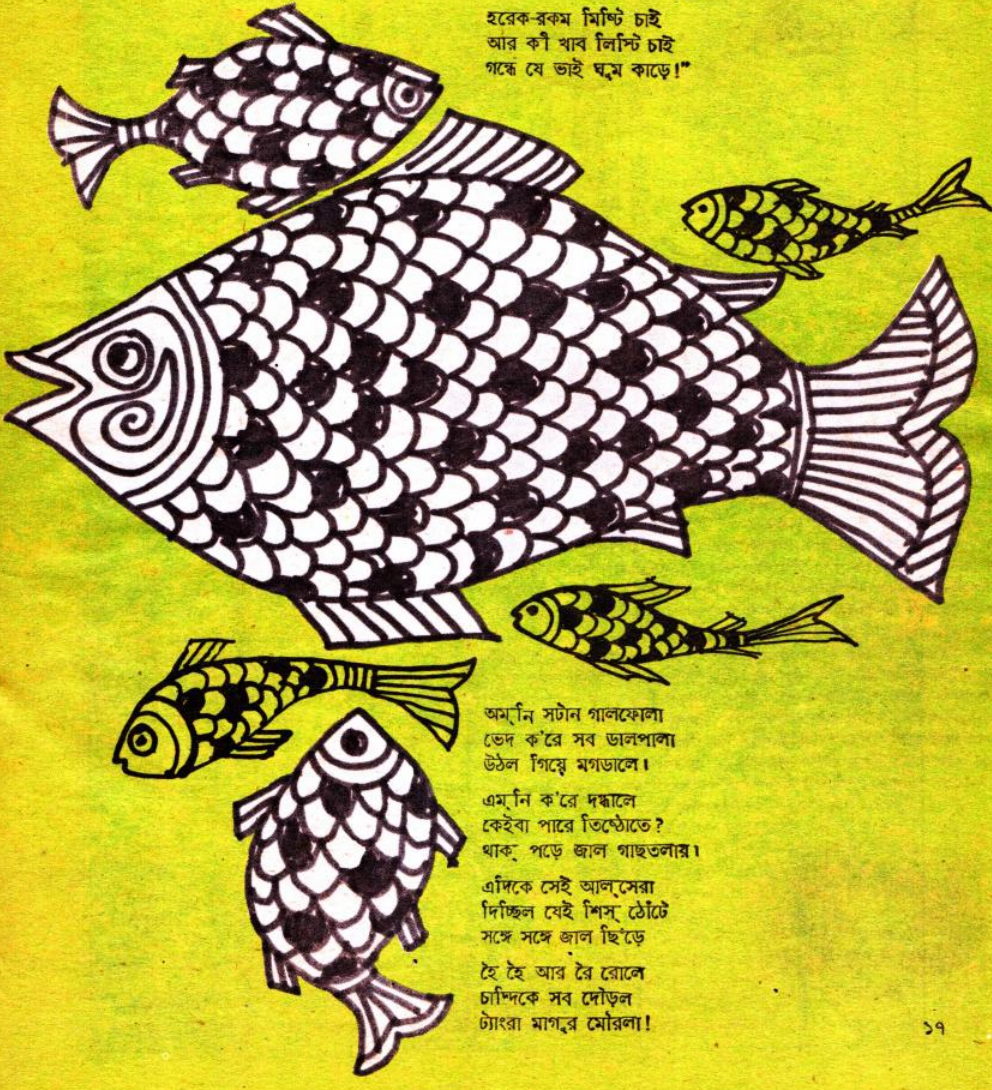

অম্‌নি সটান গালফোলা
ভেদ ক'রে সব ডালপালা
উঠল গিয়ে মগডালে।

এম্‌নি ক'রে দদ্ধালে
কেইবা পারে তিষ্ঠোতে?
থাক্ পড়ে জাল গাছতলায়।

এদিকে সেই আল্‌সেরা
দিচ্ছিল যেই শিস্ ঠোঁটে
সঙ্গে সঙ্গে জাল ছিঁড়ে

হৈ হৈ আর রৈ রোলে
চাদ্দিকে সব দৌড়ল
ট্যাংরা মাগুর মৌরলা!

হাতে সোনার বাট! তাহলে নিশ্চয় টারজান ওদের সঙ্গে আছে। সে-ই আমাকে বাঁচাবে!
কোথায় টারজান? তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কী হল তার?
টারজান, যেখানেই থাকো, এসে আমাকে বাঁচাও!
শেষ ওয়াজিরি-সেনাটিও যখন এপারে এসেছে...
এ কী! এন্‌গিরে! ম্‌গাম্বি! বেহুঁশ! কেন?
আরে, সেতুটাকে ফেলে দিচ্ছে!
যাঃ!
আঃ!
ম্‌গাম্বি! কী হয়েছিল এখানে?
মানুষ-দানোরা লেডি জেনকে নিয়ে গেছে! আমরা ঠেকাতে পারিনি! কিন্তু ...কিন্তু টারজান কোথায়?
একটা মস্ত মাকড়শা টারজানকে টেনে নিয়ে গেছে! মাভিরোও তার পিছন-পিছন ছুটেছিল! আর-কিছু জানি না!
আমরা এখন সোনা নিয়ে ঘরে ফিরব!
তাহলে আমিই যাব লেডি জেনকে উদ্ধার করতে!
কিন্তু খাদটা পার হব কী করে?
হ্যাঁ, হয়েছে!
ভাল করে বাঁধো! যাতে গেরো ফসকে খাদে না পড়ে যাই! তারপরে আমাকে ওপারে ছুঁড়ে দাও!
হুউউউ
উউউশ

এর পর আগামী সংখ্যায়

সরস্বতীর কাণ্ড

কুম্ভক

নন্তু সেদিন লাফাতে লাফাতে এসে বলে, এবার যা জব্দ করেছি-না সবাইকে! সব্বার কাছ থেকে আদায় করেছি চাঁদা।

টুম্পি জিজ্ঞেস করে, কী করে পারলি রে দাদা?

বানান শিখে গিয়েছিলাম যে। সবাই ভাবে যে 'সরস্বতী' বানানটা আর বলতে পারবে না কিছুতেই। সবার ওই এক কথা ঃ বানান করো দেখি খোকা সরস্বতী! করে দিই সঙ্গে সঙ্গে। অমনি মুখ চুন ; হাত বাড়ালেই চাঁদা।

শুনে বেশ খুশী হল টুম্পি। একটু পরে জিজ্ঞেস করল আবার, কী করে পারলি দাদা? এ শব্দটাও বুঝি ভাঙা যায়?

নন্তু হঠাৎ বইপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ল অনেকটা। কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, এইরকম মুখের ভাব। টুম্পি আবার বলে, বল্ না দাদা—

থাম্ তো। বড্ড গোলমাল করিস।

কাজেই আমাকেই এবার নামতে হল আসরে। বললাম, ভাঙা যাবে না কেন? ভাঙবি তুই? এই দেখ্ ঃ সরস্ আর বতী, এই হল সরস্বতী। যদি হত সরস্ আর বান্, তাহলে বলতুম সরস্বান্।

ও আবার কী বললে কাকু? ও-রকম কোনো শব্দ হয় নাকি?

বাংলায় বলে না বটে কেউ, তবে লিখতেও পারে কেউ ইচ্ছে করলে। সরস্ হল জল। আর বান্ জুড়ে দিলে বোঝায় 'আছে'। অবিশ্যি, সংস্কৃতে একসময়ে সরস্বান্ বলতে বোঝাত মন। ওরই স্ত্রীলিঙ্গে হল বতী। কী রে টুম্পি, বোঝা যাচ্ছে এবার? যেমন ধর্ স্রোতস্বান্-স্রোতস্বতী। তেজস্বান্-তেজস্বতী। তেজস অর্থাৎ তেজঃ অর্থাৎ তেজ আছে যার। তেমনি আবার, বল আছে যার—

নন্তু ততক্ষণে একটু বল ফিরে পেয়েছে। কথা কেড়ে নিয়ে বলল, বলবান্।

ঠিক।

এমন যেন আরো কতই বলতে পারে, এইরকম মুখ করে নন্তু বলতে লাগল, দয়াবান্ মায়াবান্ জ্ঞান-বান্ গুণবান্—

শুনতে শুনতে হঠাৎ টুম্পির মুখ ফশকে বেরিয়ে এল, দারোয়ান্, গায় গান।

আর তাই শুনে নন্তুর কী হাসি। টুম্পিও একটু লাজুক-লাজুক হাসতে লাগল। আসলে, দাদা এতগুলি বলছে আর সে একটাও বলবে না, এটা তার পছন্দ হচ্ছিল না।

জানলা দিয়ে সেনবাবুদের দারোয়ানকে দেখেই তার বলে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল, দারোয়ান।

হাসির দমক একটু যখন কমেছে, তখন বললাম, টুম্পি কিন্তু ভুল বলিসনি। দারোয়ানও হয়, ওইরকম করেই হয়। দরজায় থাকে তো, তাই কথাটা হল দ্বারবান্। তারই থেকে এখন আমরা বলি দারোয়ান।

শুনে, প্রথমে একটু চুপ করে রইল দুজন। অল্প পরে ভারিক্কি চালে টুম্পি বলে উঠল, জানি তো।

জানিস? বেশ। আচ্ছা বল্ নন্তু, আরো কয়েকটা বল ও-রকম।

বলব আরো? ধনবান্ পুণ্যবান্ রুচিবান্—

এই এই এই। দাঁড়া দাঁড়া। বলে গেলেই হল? রুচিবান্ আবার কী? ওটা হবে না। বল্ রুচিমান্।

কেন? তা কেন বলব?

না যদি বলিস, তাহলে তোকে বলব বুদ্ধিবান্। কিছুতেই তোকে বুদ্ধিমান্ বলব না। কী? কোন্‌টা বলিস, বুদ্ধিবান্ বা বুদ্ধিমান্?

বুদ্ধিমান্।

সেইরকমই হল রুচিমান্। আরো এ-রকম দেখবি? শ্রীমান্ ধীমান্ অংশুমান্ আয়ুষ্মান্।

কী করে তুমি বুঝতে পারো গো কাকু?—টুম্পির কাতর গলা শোনা গেল।

তোরাও পারবি বুঝতে। পারবি না কেন? কোন্-খানে বান্ আর কোন্‌খানে মান্ লাগছে, শব্দকটা দেখ্ না একটু নেড়েচেড়ে। দেখ্ না, ধরতে পারিস কিনা দুদল শব্দের কোনো তফাত।

নন্তু অনেকক্ষণ টান-টান শুয়ে থাকল বিছানায়। তারপর হঠাৎ আর্কিমিডিসের মতো ঝাঁপিয়ে উঠে বলল, ধরেছি ধরেছি। যে-শব্দগুলির শেষে অ আ আছে, তাতে তুমি বান্ লাগাচ্ছ। আর ই উ থাকলেই মান্। ঠিক? ঠিক বলেছি?

আরে দূর, আমি লাগাবার কে? ওরা নিজেরাই তো লেগে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিকই ধরেছিস তুই ব্যাপারটা। এখন থেকে তোকে আর হনুবান্ বলা যাবে না, বলতেই হবে হনুমান্।

ওদিকে, টুম্পির ততক্ষণে মাথায় হাত উঠেছে। চোখ গোল-গোল করে বলে উঠল, ওঃহো, এইজন্যেই একজনকে বলে হনুমান্ আর অন্যজনকে জাম্ববান্! তাই ওটা জাম্বু হয় না? মা-সরস্বতীর কী কাণ্ড! অবাক্, অবাক্!

উপন্যাস

রাজা হওয়ার ঝকমারি

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে

বোম্বাগড়ের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। মরকত-মণিটিকে কেটে দু-ভাগ করা যায় না; তাই সেটিকে দেবেন এমন লোককে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ। আর শ্রেষ্ঠ নির্বোধকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, সেই রাজপুত্রই বসবে সিংহাসনে। রাজা বানপ্রস্থে গেলেন. মন্ত্রীমশাই শূন্য-সিংহাসনে রাজমুকুট বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, আর দুই রাজপুত্র বার হলেন নির্বোধ খুঁজতে। ছ মাসের মধ্যে বোকা খুঁজে বার করা চাই। কিন্তু সারা রাজ্য ঢুঁড়েও তেমন বোকা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বনবাসী মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী দুই রাজপুত্র দুই জাহাজে করে জম্বুদ্বীপে গেলেন। ছোট রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ ও তার ভৃত্য মধু সেখানে যাকে বোকা ঠাউরেছিল, পরে দেখা গেল, সে অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। তারই চক্রান্তে কান্তি ও মধুকে কয়েদখানায় পুরে দেওয়া হল। ওদিকে, বড় রাজপুত্র কীর্তিনারায়ণও জম্বুদ্বীপে এসে বোকা খুঁজছিল। কিন্তু তারও হল একই রকমের অভিজ্ঞতা। শাস্ত্রীও চক্রান্ত করে গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে তাকে ও তার ভৃত্যকে আটক করল। শূলে চড়াবার জন্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হল সেই হাজতখানায়, যেখানে কান্তিনারায়ণও বন্দী হয়ে আছে। কীর্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার জন্য ঘুষ দিতে হবে। ঘুষের মোহর আনবার জন্যে কীর্তি একটা চিঠি লিখে হাজতের প্রহরীকে তার জাহাজে খাজাঞ্চীর কাছে পাঠাল। কিন্তু খাজাঞ্চী সেই খবর নিয়ে ফিরে এল বোম্বাগড়ে. আর বোম্বাগড়ের সৈন্যসামন্তরাও অমনি জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করে বন্দী রাজপুত্রদের উদ্ধার করল। খবর গেল রাজা-মশাইয়ের কাছে। তিনি তখন ঢেকুর না-ওঠায় ছটফট করছিলেন। তারপর—

॥ বারো ॥

অনেক দিনের পর দুই ভাইয়ে মিলন। দুজনের চোখেই জল এসে গেল। কতকাল একসঙ্গে খেলা করেছে, কতকাল একই গুরু-মশাইয়ের কাছে পড়েছে, একই ছাদের তলায় একই বিছানায় দুজনে শুয়েছে। এক-কথায় মানুষই হয়েছে দুজনে একই বাপ-মায়ের স্নেহ পেয়ে।

কান্তিনারায়ণ বললে, "দাদা, এখন কী হবে?"

কীর্তিনারায়ণ বললে, "কী হবে তা আমি জানি না, আর সে-কথা ভাববার সময়ও নেই আমার এখন।"

কান্তিনারায়ণ বললে, "জম্বুদ্বীপের মানুষ যে এত ধড়িবাজ, এত ফন্দিবাজ, তা আগে জানলে আমি এখানে আসতুম না—"

কীর্তিনারায়ণও বললে, "আমিও তাই ভাবছি ভাই, আমাদের আর কতটুকুই বা জীবন, আর কতই বা বয়েস, কিন্তু মনে হয় এ-দেশে বোকা খুঁজতে আসা বোকামি, এ-দেশের মানুষ সবাই এক-একটা মূর্তিমান শয়তান। শুধু বাইরে সবাই ভদ্রলোকের পোশাক পরে থাকে—"

কিন্তু এত কথা বলবার সময় তখন ছিল না। সবাই তখন রাজপুত্রদের পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে, "জয়, মা বিশালাক্ষী দেবীর জয়!"

কোতোয়াল নরহরি ভদ্র মশাই ততক্ষণে হাজতখানা থেকে সব কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে। যারা ছাড়া পেয়েছে তারাও তখন আনন্দের চোটে লাফাতে শুরু করেছে। তারাও বোম্বাগড়ের সৈন্যদের দলে যোগ দিয়েছে। তারাও তাদের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে: জয় মা বিশালাক্ষী দেবীর জয়!

সে এক ভয়াবহ অবস্থা তখন চারদিকে। ওদিকে বোম্বাগড়ের সেনাপতি রণজিতেন্দ্র পাঠক মশাইও চুপ করে বসে নেই। তিনি তখন রে-রে-রে-রে করে সারাদেশ অধিকার করতে আরম্ভ করেছেন। ভাঙা মরচে-পড়া তলোয়ার আর নড়বড়ে কামান দিয়ে সারা জম্বুদ্বীপের মনে ভয় জাগিয়ে তুলেছেন।

রাজা দশবাহুবীরের তখনও ঢেকুরটা উঠছে না। সকাল থেকে তাঁর যে বুকের ব্যথা, তা তখন আরো বেড়েছে। তিনি একবার উঠছেন, আর একবার বসছেন। রাজবৈদ্যকে সামনে থেকে উঠে যেতে দেওয়া হয়নি। সে খল-নুড়ি আর জড়ি-বুটি নিয়ে সেই ঘরেই বসে আছে। একটা করে ওষুধ বানাচ্ছে আর রাজামশাইকে খাওয়াচ্ছে।

বলছে, "এইটে খেয়ে নিন রাজামশাই, এইটে খেয়ে নিলেই আপনার ঢেকুর উঠবে—"

কিন্তু কোথায় কী? মরুভূমিতে বৃষ্টি পড়লে যেমন সব শুষে নেয়, রাজামশাইয়ের পেটও তেমনি। রাজ-বৈদ্যের সব পাচন, সব মকরধ্বজ, সব স্বর্ণ-সিন্দুর তাঁর পেট একেবারে হজম করে নিচ্ছিল। ওগুলো পেটে গিয়ে ঢোকবার পর আর কিছু সাড়া-শব্দ করছিল না। যখন এই রকম অবস্থা, তখন আবার ডাক পড়ল কোতোয়ালের। কোতোয়ালকে ডাকতে গেল লোক। যে-লোক ডাকতে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে বললে, "কোতোয়াল নেই, রাজামশাই।"

"নেই মানে?"

লোক বললে, "তিনি তাঁর দরবারে নেই।"

"নেই তো গেল কোথায়?"

রেগে গিয়ে রাজামশাই আবার প্রশ্ন করলেন, "সে কি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল নাকি?"

লোকটা বললে, "হ্যাঁ, তিনি পালিয়ে গেছেন!

জম্বুদ্বীপের মহাপ্রতাপান্বিত রাজামশাই দশবাহুবীর চমকে উঠলেন। পালিয়ে গেল মানে? পালিয়ে গেল মানেটা কী? তবে কি কোতোয়াল বিদ্রোহ করলে নাকি? এতদিন কোতোয়ালের ওপর ভরসা করেই তো তিনি রাজত্ব করে এসেছেন। কোতোয়ালই সব কাজ-কর্ম চালিয়ে এসেছে আর তিনি আরাম করে দাবা খেলেছেন। কাঠের রাজা-মন্ত্রী-গজ-নৌকো নিয়ে আরাম করে সময় কাটিয়েছেন।

কিন্তু যদি কোতোয়ালই পালিয়ে যায় তো এই রাজবৈদ্য বেটাকে শূলে চড়াবে কে? আর এই সব মন্ত্রী-দেরই বা কে শূলে চড়াবে?

যদি কোতোয়ালই পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জায়গায় অন্য কোতোয়াল বহাল করতে হবে। কে হবে নতুন কোতোয়াল? কাকে তিনি বিশ্বাস করে কোতোয়ালের পদে বহাল করবেন?

ভাবতে-ভাবতে তাঁর মাথা আরো গোলমাল হয়ে গেল। একে নিজের ঢেকুর উঠছে না, তার ওপর নতুন কোতোয়াল বেছে তাকে বহাল করবার ভাবনা। ভাবনা কি একটা!

রাজা দশবাহুবীরের খুবই রাগ হয়ে গেল। সবাই ফাঁকিবাজ। কেউ কাজ করবে না, কেবল বসে বসে মাইনে খাবে। যেমন হয়েছে মন্ত্রীগুলো, তেমনি হয়েছে কোতোয়াল বেটা।

কিন্তু এই বেটাকে এখন কে শূলে চড়াবে?

যে-লোকটা কোতোয়ালকে ডাকতে গিয়েছিল, সে তখনও হুকুমের অপেক্ষায় সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাজামশাই তার দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে গেলেন।

বললেন, "অ্যাই, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস? মজা দেখছিস?"

লোকটা বললে, "আজ্ঞে, না—"

রাজামশাই বললেন, "তাহলে এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে কী করছিস?"

লোকটা বললে, "আজ্ঞে, আমি আপনার হুকুম-বরদার, আপনি যা হুকুম করবেন তাই তামিল করব। বলুন কী হুকুম?"

রাজামশাই আরো ক্ষেপে গেলেন। বললেন, "আমি হুকুম করবো তবে তুই তামিল করবি? তোর একটা বুদ্ধি-বিবেচনা কিছু নেই?"

"আজ্ঞে, আমার যদি কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা থাকত তাহলে কি আর আপনার কাছে চাকরি করি?"

রাজামশাই বললেন, "খুব মজা তোর, না? আমার এদিকে ঢেকুর উঠছে না সকাল থেকে আর তোর খুব আনন্দ হচ্ছে! আচ্ছা ঠিক আছে, কোতোয়াল ফিরে এলে আমি তোকে আগে শূলে চড়াব তা বলে রাখছি।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "আগে তোকে শূলে চড়াব, তারপর শূলে চড়াব এই রাজবদ্যিটাকে। এ-ব্যাটা আমার ঢেকুর তোলাতে পারছে না, এমন বেকুব। আর তারপর শূলে চড়াব সব কটা মন্ত্রীকে—আর সকলের শেষে শূলে চড়াব সেই কোতোয়ালটাকে। সে-ই হচ্ছে পয়লা নম্বরের শয়তান—"

কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল। কারা যেন চিৎকার করছে—জয়, মা বিশালাক্ষী দেবীর জয়...

রাজামশাইয়ের কানে গেল আওয়াজটা।

জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁরা চেঁচাচ্ছে? ওটা কিসের আওয়াজ?"

লোকটা বললে, "আজ্ঞে, বোম্বাগড়ের সৈন্যরা আমাদের জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করেছে।"

"কী বললি?"

লোকটা আবার স্পষ্ট গলায় বললে, "আজ্ঞে, বোম্বা-গড়ের সৈন্যরা আমাদের জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করেছে।"

"কেন? আক্রমণ করেছে কেন?"

লোকটা বললে, "ওরা আমাদের দেশ জয় করতে চায়।"

"কেন? আমরা ওদের কী করেছি যে আমাদের দেশ ওরা জয় করতে চায়? আমরা তো কারোর কিছু ক্ষতি করিনি। আমি তো কারোর দেশ জয় করতেও চাইনি, তবু কেন ওরা আমার দেশ জয় করবে?"

আওয়াজটা তখন আরো কানের কাছে এসেছে। রাজামশাই ছট-ফট্ করতে লাগলেন।

বললেন, "তা আমার কোতোয়াল, আমার সেনাপতি, সৈন্য-সামন্ত, তারা সব কী করছে? তারা কি সব নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? তারা সব মাইনে পাচ্ছে কীজন্যে? ডাকো তাদের আমার কাছে। সবাইকে ডাকো। কোতোয়ালকে ডাকো, সেনাপতিকে ডাকো, আমি তাদের বসে-বসে মাইনে পাওয়া ঘোচাচ্ছি। তাদের আমি আজই শূলে চড়াব সবাইকে। আর মন্ত্রীদেরও ডাকো, তারাও কিছু কাজ করে না কেউ, কেবল মাইনে খায় বসে বসে—"

লোকটা বললে, "ডাকব কাকে, কেউ তো নেই হুজুর—"

"কেউ নেই মানে? দরবারে না থাকে সকলের বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়—"

"আজ্ঞে, তারা কেউ বাড়িতেও নেই। সবাই জীবনের ভয়ে পালিয়েছে।"

রাজামশাই বললেন, "কিন্তু আমার কাছে তারা তো পালাবার অনুমতি নেয়নি কেউ। আমার কাছে পালাবার অনুমতি না-নিয়েই পালিয়ে গেল?"

ততক্ষণে রাজ-প্রাসাদের ভেতরেই চিৎকার উঠল—জয়, মা বিশালাক্ষী দেবীর জয়—

রাজামশাই বললেন, "এখন কী হবে?"

লোকটা বললে, "আপনিও পালান হুজুর, নইলে আপনারও রক্ষে থাকবে না।"

রাজামশাই বললেন, "কী বলছিস তুই? আমার যে এখনও ঢেকুর ওঠেনি, আমি পালাব কী করে?"

লোকটা বললে, "আমি চিরকাল আপনার নুন খেয়ে আসছি, আমি কখনও নিমক-হারামি করব না হুজুর। করলে আমি আগেই পালিয়ে যেতুম।"

"তা তো বুঝলুম, কিন্তু ঢেকুর না উঠলে আমি নড়ি কী করে? এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি!"

তারপর কী ভেবে বললেন, "তা যাক্‌গে, ঢেকুর না-উঠল তো না-উঠুক, ঢেকুরের চেয়ে প্রাণের দামই বড়, চল্ পালিয়ে যাই, পরে ফিরে এসে ভাবব কাকে কাকে শূলে চড়াব আর কাকে কাকে শূলে চড়াব না।"

বলে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন।

বললেন, "কিন্তু কোথায় পালিয়ে যাওয়া যায় বল্ তো? কোথায় গেলে প্রাণে বাঁচা যায়?"

হুকুম-বরদার লোকটা বললে, "আপনি যেখানে পালাতে চাইবেন আমি সেখানেই আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। বলুন আপনি কোথায় পালিয়ে যেতে চান?"

রাজামশাই বললেন, "এই সমস্ত ধড়া-চূড়ো পরে পালালে তো লোকে আমাকে চিনতে পারবে, এ পোশাক তো বদলাতে হবে আগে কিন্তু কী পোশাক পরি?"

হুকুম-বরদার লোকটা বললে, "আপনি আমার এই জামা-কাপড় পরতে পারেন, আর আমি না হয় অন্য ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে নেব।"

রাজামশাই বললেন, "তা তাই নে--"

বলে রাজামশাই অতি কষ্টে বিছানা থেকে উঠলেন। হঠাৎ কোন্ ফাঁকে রাজবৈদ্য কখন পালিয়ে গেছে সেদিকে তখন কারোরই খেয়াল নেই। রাজামশাই তখন নিজের ধড়া-চুড়ো ছাড়তেই ব্যস্ত। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই একদল সৈন্য-সামন্ত সেই ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

রাজামশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কে? কে? কে তোমরা? কী চাও?"

কিন্তু কেউ কিছু বলবার সুযোগ দিলে না তাঁকে। তাদের মধ্যে একজন ঢাল তরোয়াল নিয়ে একেবারে সোজা রাজা-মশাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, "তোমার যম!"

রাজামশাই বললেন, "কেন? কেন? আমি কী করেছি তোমাদের? তোমরা বলো আমি কী অপরাধ করেছি?"

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

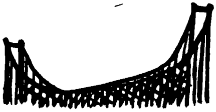

তোমাদের কলকাতা

গত সংখ্যায় খোলা-মেলা জায়গার কথা বলেছিলাম। বলা হয়েছিল কলকাতায় যা আছে সেটুকু যদি ভাল থাকে তার জন্য সকলের চেষ্টা করা দরকার। সেদিন উল্টাডাঙ্গা-মানিকতলা অঞ্চলে বিধান শিশু উদ্যানে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের খেলা করবার, ঘুরে বেড়াবার, পিকনিক করবার, সাঁতার কাটবার কি চমৎকার জায়গা! অত ভাল আর অত বড় না হলেও ছোট ছোট পার্কও সুন্দর হতে পারে। হাওড়ার ষষ্ঠীতলার কাছে পার্কটি, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির কাছে পার্কটি এর নিদর্শন।

এগুলি অবশ্য সি.এম.ডি.এ'র অর্থানুকূল্যে হয়েছে। সেই সি.এম.ডি.এ. অফিসে চেয়ারম্যান, শ্রীভোলানাথ সেনের কাছে সেদিন একটা চিঠি দেখছিলাম। হিন্দী হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর শ্রীগৌতম চৌধুরী লিখছে—গ্যালিফ ষ্ট্রীট আর বি. টি. রোডের সংযোগস্থলে দুটো বট গাছের নীচে ছেলেদের বসবার ভাল জায়গা হতে পারে। তার আবেদনে সাড়া দেবার মত প্রতিষ্ঠান কি নেই?

সেই কথাই বলছিলাম, সমবেত চেষ্টার দরকার, সকলেরই কিছু কিছু করা দরকার। কত নামী প্রতিষ্ঠান আছে তারা কি এই শ্রেণীর ছোট ছোট পার্ক, বসবার জায়গা, খেলার জায়গা আর ফুল ও ফলের গাছ তৈরি করে দিতে পারে না?

এগুলি অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর হবে, কিন্তু কলকাতাকে আসল সুন্দর করতে হলে লোকের মনে এনে দিতে হবে নতুন ভাবনা, শহর সম্বন্ধে সচেতনতা এবং চিন্তা।

আমরা সব সময় ভাবছি জলের সরবরাহ তো কিছুটা বেড়েছে সি.এম.ডি.এ'র দৌলতে। কিন্তু প্রয়োজন তো অনেক বেশি? কাজেই জলের অপচয় যেন না হয়। রাস্তার কল দিয়ে অঝোরে যেন জল না পড়ে সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।

গত বর্ষার সময় কলকাতার অনেক জায়গায় কম জল জমেছিল বা জমাজল বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি তাহলেও অনেক নালা-নর্দমা করতে হবে। তার চেয়ে বেশি দরকার এখনকার নালা নর্দমা যাতে ডাবের খোলা, খোলাম কুচি, ছাই, গোবর, খড় ইত্যাদি দিয়ে ভরে গিয়ে জলনিকাশী ব্যবস্থা যেন আটকে না যায়।

তেমনি ভাবে এতগুলি রাস্তাও চওড়া হল, সি. এম.ডি.এ'র চেষ্টায়, কয়েকটি ব্রিজও হয়ে গেছে, কিন্তু বাস ট্রামের ভিড় আগের মতনই প্রকট। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে লোকে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। তার জন্য হবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, পাতাল রেল। কিন্তু এখনও আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ভিড়ের বাসে-ট্রামে মহিলারা, বৃদ্ধরা, অক্ষমরা বা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা একটু সুবিধা এবং একটু সম্মান পায়। "কিউ" ব্যবস্থাও ভাল।

আমরা সবাই চাচ্ছি কলকাতার সুনাম বাড়াতে, সুনাম বাড়বে যদি আমরা চেষ্টা করি সব জিনিষ সুন্দর করতে, আমরা চেষ্টা করি আরেকটু ভালভাবে থাকতে। একদিনে কলকাতা মহা-সুন্দরী হবে না, তবে রোজ যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে একদিন কলকাতার সুনাম সারা-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বেই।

বেহালা আর্য মন্দিরের ক্লাস এইটের ছাত্র শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জী ডায়মণ্ডহারবার রোডের উদাহরণ দিয়ে লিখেছে, "সি.এম.ডি.এ. মানে 'কাটছি মাটি দেখবি আয়,' বলে অনেকে ব্যঙ্গ করেন। আমি তাঁদের বলবো, শেষ অবধি দেখো।" অর্থাৎ বিপ্লব জানে কলকাতার ভবিষ্যত উজ্জ্বল—কলকাতার উন্নয়ন কেউ ঠেকাতে পারবে না। কলকাতাবাসী সকলেই এখন এইরকম আশাবাদী হলেই হবে না—একটু কর্মযোগও দরকার। অর্থাৎ চেষ্টা দরকার। শহরটাকে ভালবাসার শহর করতে হলে সকলেরই কিছু না কিছু ভাল কাজ করা দরকার। গৌতম-বিপ্লবদের মত ভোলা, শিবু, দেবুদেরও অনেক কিছু করবার আছে। পুরোনো অনেক কিছুই তো পালটে যাচ্ছে—এখন কিছু অভ্যাসের পরিবর্তন দরকার। যেমন রাস্তায় জঞ্জাল না ফেলা, জলের অপচয় না করা, বস্তীবাসীকে অবজ্ঞা না করা…

বিধান শিশু উদ্যান

আমাদের কলকাতা

রত্নাকর

হাওড়া সাবওয়ে। মাটির তলায় টিকিট-ঘর

প্রিয় মেজদি,

মীনু না সেদিন ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে-শুনতে বায়না ধরল, "আমাকে একটা অজগর সাপ এনে দাও। আমি তার পিঠে চড়ে পাতালে যাব।" ঠাকুমা বলল, "সাপ তো জঙ্গলে থাকে, এখানে আসবে কী করে ?" তাই না শুনে মীনুর সে কী কান্না। কান্না আর কিছুতেই থামে না, তখন ছোটমামা বলল, "ঠিক আছে, জামা-জুতো পরে নাও, আমি তোমাকে পাতালে নিয়ে যাব।"

আমি আর মীনু ছোটমামার সঙ্গে একটা লাল দোতলা বাসে উঠলাম। আমি তো বড়, আমি জানি, পাতাল-টাতাল শুধু গল্পে থাকে। তাই ছোটমামাকে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?" ছোটমামা অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "পাতালে, পাতালে।" শুনে আমার এত রাগ হয়ে গিয়েছিল যে, বাসের মধ্যে ছোটমামার সঙ্গে আর একটাও কথা বলিনি।

বাস গিয়ে থামল হাওড়া স্টেশনে। আমরা নামলাম। ছোটমামা মীনুকে জিজ্ঞেস করল, "মীনু, পাতাল কোথায় থাকে ?" মীনু বলল, "মাটির নীচে।" ছোটমামা বলল, "তাহলে চলো মাটির নীচে যাই।" ওমা ! সত্যি-সত্যি মাটির নীচে যাবার কী সুন্দর রাস্তা, কতো সিঁড়ি, চারদিকে ঝলমলে আলো। কিন্তু পাতালে যেতে মীনুর সে কী ভয়! প্রথমে নামতেই রাজী হচ্ছিল না, তারপরে অনেককে নামতে দেখে ওর সাহস হল। নামবার পরে ওর এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, কিছুতেই আর ওপরে উঠতে চাইছিল না। মীনু তো আর বুঝতে পারেনি যে, ওটা সত্যি-সত্যি পাতাল নয়, ওর নাম সুড়ঙ্গ-পথ, ইংরেজীতে যাকে বলে সাবওয়ে।

সত্যি মেজদি, কী সুন্দর সাবওয়ে। আমি এই প্রথম গেলাম। মনে হচ্ছিল, আর-একটা হাওড়া স্টেশন তৈরি হয়েছে মাটির নীচে। টিকিট-ঘর আছে, খোঁজ-খবর করবার অফিস আছে, আর আছে মাথার ওপর অনেকগুলো আলো। কত রাস্তা। কারও যাতে পথ ভুল না হয় সেইজন্যে প্রত্যেক রাস্তার মুখে তীর-চিহ্ন দিয়ে বড়-বড় করে লেখা আছে কোন্ পথ কোথায় গেছে।

ছোটমামা বলল, "যখন হাওড়ায় সুড়ঙ্গ-পথ ছিল না, তখন রাস্তায় ভীষণ ভিড় হত। এত ভিড় হত যে না পারত মানুষজন হাঁটতে, না পারত গাড়িঘোড়া চলতে। এখন গাড়ি যায় ওপর দিয়ে, মানুষ যায় নীচে দিয়ে। সেইজন্যে আগের মতো আর ভিড় হতে পারে না। তুমি কদ্দিন হল কলকাতায় আসোনি। এবার যখন আসবে সাবওয়ে দেখে চমকে উঠবে। তুমি কিন্তু আবার মীনুকে বলে দিও না যে, ওটা রূপকথার পাতাল নয়। বলে দিলে ও ঠিক কাঁদতে বসবে। আমার প্রণাম নিও।

তোমার শর্মী

বিমল কর

কাপালিকেরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

তারাপদ থাকত কলকাতায়। মেসবাড়িতে। একদিন সে হঠাৎ জানতে পারল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তার ভাগ্যে নাচছে। ভদ্রলোক তারাপদর এক মেসোমশাই, মধুপুরের কাছে শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ বন্ধু চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সঙ্গে, নাম তাঁর কিঙ্করকিশোর রায়, ছোট করে 'কিকিরা'।

সন্ধেবেলায় এক রহস্যময় ঘরে আরও রহস্যজনক অবস্থায় ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা হতে লাগল তারাপদদের। তিনি মৃতজনের আত্মাকে ডেকে নিয়ে আসেন। সেই ঘরে ভুজঙ্গভূষণ তারাপদর মা-বাবা-বোনের আত্মাকে হাজির করালেন। তারাপদ কিলিত হয়ে পড়ল। চন্দন তাকে বোঝাতে পারছিল না, হয়ত এটা কোন রকমের ভেলকি।

তারাপদকে ভুজঙ্গভূষণের খপ্পর থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল চন্দন। কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারাপদ বিশ্বাসই করবে না যে, সবই ভেলকি। চন্দন তারাপদকে জোর করে নিয়ে এল কিকিরার কাছে। কিকিরাই যদি তা প্রমাণ করতে পারেন। কিকিরা প্রমাণ করে দেখালেন ভুজঙ্গ কেমন করে আত্মাদের ডেকে আনে। তারাপদ ভেলকিটা বুঝতে পারল।

॥ বারো ॥

সন্ধের পর পর তারাপদ ভুজঙ্গভূষণের আত্মা-নামানোর সেই রহস্যময় ঘরে এসে বসল। আজ সে একা, চন্দন নেই। চন্দন আসবে না।

দুপুরটা যে কেমন করে কেটেছে, তারাপদ নিজেই শুধু জানে, আর জানে চন্দন। উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছিল মাঝে মাঝে; দুঃখে ঘৃণায় এক এক সময় সে খেপার মতন কাণ্ড করছিল। চন্দন তাকে অনেক কষ্টে সামলেছে। বলেছে, "ওরকম করিস না তারা, ভুজঙ্গর কোনো চেলা যদি একবার বুঝতে পারে আমরা ভুজঙ্গর সিক্রেট জানতে পেরেছি তা হলে তুইও গেলি, আমিও গেলাম। নিজেকে কণ্ট্রোল কর। তোকে এখন অ্যাক্টিং করতে হবে, কিকিরা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন।"

চন্দন অনেক বুদ্ধিমান। তারাপদর ওই ছটফটে ভাবটাকে সে বুদ্ধি করে কাজে লাগাল। কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলল বন্ধুকে। তারপর মৃত্যুঞ্জয়কে ডেকে পাঠাল। তারাপদকে বলল, "ভুজঙ্গর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চাস তুই; একলা। শেষ বারের মতন তোর মা বাবার কাছে দুটো কথা জানতে চাস। বুঝলি?"

তারাপদ সবই বুঝল। ভুজঙ্গর ওই ঘরে বসে আজ তাকে সত্যিই অনেক কিছু করতে হবে। কিকিরা বলে দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় এল, চন্দনই কথা বলল বেশী, তারাপদ কেমন ভেঙে পড়েছে, কী ভীষণ কান্নাকাটি করছে—এই সব বুঝিয়ে বলল, আজ আর-একবার সে ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তারাপদ প্রায় কিছুই বলল না, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তার চোখমুখ দেখে মৃত্যুঞ্জয় কী ভাবল কে জানে, ভুজঙ্গভূষণকে তারাপদর কথা বলতে গেল। খানিকটা পরেই আবার ফিরে এল, বলল, "হ্যাঁ—দেখা হবে।"

সেই দেখা করতেই তারাপদ এখন সন্ধেবেলায় ভুজঙ্গভূষণের রহস্যময় ঘরে এসে বসেছে। একলা।

তারাপদ চুপচাপ বসেই থাকল। আজ কদিন আসা-যাওয়া করতে করতে এই ঘর তারাপদর চেনা হয়ে গেছে। অভ্যেসও হয়ে এসেছে অনেকটা। আগের মতন অতটা গা-ছমছম করে না। তবু এই ঘরের একটা ভৌতিক পরিবেশ রয়েছে, মন যেন অন্যরকম হয়ে যায়, বুকের মধ্যে শির-শিরে ভাব হয়।

তারাপদ এ-পাশ ও-পাশ তাকাতে লাগল। এত অস্পষ্ট, প্রায়-ঘুটঘুটে ঘরে কোনো কিছুই ভাল করে দেখা যায় না। এই ঘর যেমন ছিল সেই রকমই রয়েছে। সেই একই মিটমিটে আলো, সেই ধুপধুনোর গন্ধ, সেই ভুজঙ্গভূষণের সিংহাসন, সেই বেড়াল।

ছোট টেবিলের ওপর বসানো কালো বেড়ালটাকে দেখল তারাপদ। এই বেড়াল তাদের খুব অবাক করেছিল, ভয়ও পাইয়ে দিয়েছিল। আজ তারাপদ কালো বেড়াল-টাকে দেখল। তার ভয় হল না। কেনই বা হবে? এটাও তো চালাকি, কিংবা মানুষকে বোকা বানিয়ে দেবার ফন্দি। চন্দন কিকিরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন করে বেড়ালটা ঘুরে যায়?

কিকিরা হেসে হেসে বলেছিলেন, ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে। ঘড়িতে দুটো কাঁটা থাকে, ছোট কাঁটা আর বড় কাঁটা, যদি একটা থাকত—কী হত? একটাই ঘুরত। খুব

পুরোনো আমলের বড় বড় দেওয়াল-ঘড়ি কিংবা দেরাজের ওপর রাখা ঘড়ি দেখেছেন, স্যার? এক একটা ঘড়ি থাকত যার মধ্যে ঘণ্টার কাঁটার ওপর ছোট্ট রঙিন পাখি বসানো থাকত মেটালের। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ঘুরত। এটাও সেই রকম, তফাতের মধ্যে কী জানেন, ঘড়ির যন্ত্রপাতিগুলো নীচে আছে, আর ওপরে—কাঁটার বদলে একটা ফাঁকো বেড়াল, পেপার পাল্পের—কিংবা হালকা কিছুর। ঠিক যেভাবে গ্রামোফোনের রেকর্ড ঘোরে—সেইভাবে বেড়ালটা ঘুরছে, তবে খুব ধীরে ধীরে—বোঝা যায় না। যদি একটা ওয়াল-ক্লক মাটিতে শুইয়ে রাখেন চিত করে—তার কাঁটাও ওইভাবে ঘুরবে।

তারাপদ কালো বেড়ালটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেবার আগেই স্তোত্রপাঠ শুরু হল। যেমন রোজই হয়—সেইরকম। দামী লাউড্‌স্পীকারটা যে কোথায় বোঝা যায় না, কিন্তু বড় নিখুঁত। এই নিঃশব্দ ঘরে চমৎকার শোনায়, মন ধীরে ধীরে কেমন যেন হয়ে যায়।

স্তোত্রপাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সেই ক্ষীণ আলো নিবে গেল। নিবে গিয়ে ভুজঙ্গভূষণের বসবার দিকটায় লাল আলো জ্বলে উঠল। ভেলভেটের পরদা সরিয়ে ভুজঙ্গভূষণ এলেন, সেই একই রক্তগৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, মুখ মুখোশে ঢাকা।

নিজের আসনে বসলেন ভুজঙ্গভূষণ। তাঁর পায়ের দিকে একপাশে ঘণ্টা।

তারাপদ এইবার ভয় পেতে শুরু করল। উত্তেজনা আর ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসছে। আজ যে কী হবে শেষ পর্যন্ত সে জানে না। হয়ত ভীষণ কোনো বিপদে পড়বে, তেমন কিছু ঘটলে বাঁচবে না মরবে—কে বলতে পারে! মনের এই ভয়ের ভাবটা কাটাবার জন্যে প্রাণপণে তারাপদ বাবার কথা ভাবতে লাগল। ওই লোকটা—ওই ভুজঙ্গভূষণ তার সরল, ভালোমানুষ, সাদাসিধে স্বভাবের বাবাকে কী ভীষণ প্রবঞ্চনা করেছে। শুধু প্রবঞ্চনা নয়, সেই প্রবঞ্চনার দরুন তার বাবা-বেচারী মিথ্যেকে সত্য বলে জেনেছে। বাবা-বেচারীর হয় মানসিক আঘাত লেগেছিল, না হয় বাবা মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে পাগলের মতন হয়ে পড়েছিল। তাতেই বাবার অসুখ, আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যু।

এই সমস্তর-জন্যে ওই ভুজঙ্গই দায়ী। বাবাকে ওই লোকটাই মেরেছে। তারাপদদের সংসার, তাদের জীবন, এত দুঃখকষ্ট, মার অত কষ্ট সওয়া—সবই ওই শয়তানটার জন্যে। তারাপদ কেমন করে লোকটাকে ক্ষমা করবে?

তারাপদকে চমকে দিয়ে ভুজঙ্গভূষণই কথা বললেন, "তারাপদ, তুমি আজ আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন? আমার শরীর ভাল নেই, ভাবছিলাম বিশ্রাম করব।"

প্রথমে কথা বলতে পারল না তারাপদ, গলা কাঠ হয়ে থাকল। বার দুই গলা পরিষ্কার করে শেষে কাঁপা কাঁপা গলায় তারাপদ বলল, "আপনার সঙ্গে আমার কটা কথা ছিল।"

"বলো।"

একটু থেমে নিজেকে সামলে নিতে নিতে তারাপদ বলল, "কাল সারা-রাত আমি ঘুমোতে পারিনি, শুধু ভেবেছি। আজও সারাদিন ভেবেছি। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি।" বলে আবার একটু থামল তারাপদ, তারপর গলায় যতটা সম্ভব আবেগ দিয়ে বলল, "পিসেমশাই, আপনি রাগ করবেন না, আপনার কথামতন আমি চলতে রাজী। কিন্তু আর একবার, একটি বার মাত্র আমি মা-বাবার কাছে তাঁদের আদেশ জানতে চাই। মনে কোনো খুঁত রাখতে চাই না। আপনি দয়া করে আজ একবার ওঁদের ডাকুন।"

"আবার?" ভুজঙ্গভূষণ বললেন।

"শুধু আজকের মতন—" তারাপদ মিনতি জানাল।

"তোমার মনে কি এখনও সন্দেহ আছে, তারাপদ? তোমার মা-বাবার যা ইচ্ছে সে তো আগেই জেনেছ।"

"আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু সব ছেড়েছুড়ে যখন আপনার এখানে চলে আসব ভাবছি—তখন আসবার আগে আর একবার মা-বাবার আদেশ নিতে চাই।"

দু মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "বেশ। আজই তোমায় মনঃস্থির করতে হবে, আর সময় পাবে না।"

ভুজঙ্গভূষণ ঘণ্টা বাজালেন। মৃত্যুঞ্জয় এল।

কিছু যেন বললেন ভুজঙ্গভূষণ, তারাপদ কিছুই শুনতে পেল না, বুঝতেও পারল না। মৃত্যুঞ্জয় চলে গেল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার বন্ধু কবে ফিরবে?"

"ফিরবে। শীঘ্র।"

তারাপদ বেশী কথা বলল না। কিছু না বলে চুপ করে থাকাই ভাল। কথা ঘুরোবার জন্যেই হোক কিংবা

আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হবে
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দারুণ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস
—'সবুজ দ্বীপের রাজা'

অন্য কোনো কারণেই হোক, তারাপদ আচমকা বলল, "পিসেমশাই, একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"আপনার এই ঘরবাড়ি সম্পত্তি আপনি কেন আমায় দিয়ে যেতে চাইছেন?"

"কেন চাইছি তোমায় বলেছি। আমার নিজের বলতে কেউ নেই, তুমি ছাড়া। আমি যা করেছি রেখেছি, তা তোমার হাতে থাকলেই খুশী হব।"

মৃত্যুঞ্জয় ততক্ষণে আবার ফিরে এল। ভুজঙ্গভূষণকে কিছু বলল মুখমাথা নামিয়ে। ভুজঙ্গ ইশারায় ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে কী দেখালেন। চলে গেল মৃত্যুঞ্জয়। একটু পরেই আর-একজন এল, ঘরের মধ্যে আবার ধুনো দিয়ে গেল, লুকোনো জায়গায় ধূপ রসিয়ে গেল।

ঘরটা আবার ধোঁয়ায় আরও অস্পষ্ট হল। ধুনো-গুগগুলের গন্ধে চাপা বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

আর-একটু পরেই সেই মেয়েটি এল। কালো শাড়ি জামা পরা, মাথায় এলো চুল। এল, ভুজঙ্গর সামনে দাঁড়াল, তারপর ঘণ্টাটা তুলে নিয়ে গোল টেবিলের অন্যদিকে বসল। আজ চন্দন নেই, সে থাকলে যেমনভাবে তিনজনে গোল হয়ে বসা যায়, কানামাছি খেলার মতন হাত ছড়িয়ে—তেমনভাবে বসা গেল না। মুখোমুখি বসতে হল; সকালে কিকিরার সামনে যেমনভাবে বসেছিল তারাপদ।

নতুন করে শেখাবার কিছু নেই। তারাপদ টেবিলের ওপর হাত ছড়িয়ে দিল, পা বাড়িয়ে দিল টেবিলের তলা দিয়ে। মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখল। অন্য দিনের

চেয়ে আজ যেন মেয়েটিকে শুকনো দেখাচ্ছে। রোগা মুখ আরও শুকনো।

এরপর রোজই যেমন হয়—সেই রকম। ঘরের বাতি নিবে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। টেবিলের ওপর তারাপদ হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত ধরে রেখেছে। তার পায়ের আঙুলের সঙ্গে মেয়েটির পায়ের আঙুল ছোঁয়ানো। ভুজঙ্গভূষণ তাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, "তারাপদ, তুমি তোমার মার কথা ভাব। তাকে ডাকো। মন যেন চঞ্চল না হয়।"

তারাপদ মা-বাবার কথা ভাবল না। কোনো প্রয়োজন নেই।

খুব সতর্ক ছিল তারাপদ। সমস্ত কিছু অনুভব করার চেষ্টা করছিল। চোখ খুলছিল মাঝেমাঝেই। যদিও চোখ খোলার কোনো অর্থ হয় না। এই জমাট অন্ধকারে এক বিঘত দূরের জিনিসও বিন্দুমাত্র চোখে পড়ে না।

প্রথমেই একটা জিনিস অনুভব করতে পারল তারাপদ। মেয়েটির ডান পায়ের আঙুল শক্ত শক্ত লাগলেও বাঁ পায়ের আঙুল অত শক্ত লাগছে না। তার মানে, আগের কদিন মেয়েটির দুটি পায়ের একটি চন্দন ছুঁয়ে থাকত, অন্য পা ছুয়ে থাকত তারাপদ। একই লোকের পক্ষে এই তফাত বোঝার উপায় ছিল না, মেয়েটির এক-পায়ের আঙুল কেন কাঠের মতন শক্ত, অন্য পায়ের আঙুল স্বাভাবিক? এই তফাতটুকু কেন?

তারাপদ খুব সহজেই এই ধাঁধা ধরে ফেলতে পারল। মেয়েটি তার ডান পায়ে নকল পাতা পরে। সেই পা কাঠ কিংবা শক্ত রবারের পায়ের ফাঁপা পাতা থেকে বের করে নিয়ে ঘণ্টা বাজায়। কিকিরা ঠিকই বলেছেন।

আজও মেয়েটি ঘণ্টা বাজাতে পারবে। সে সুযোগ তারাপদ তাকে দেবে। কিন্তু তারপর?

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সত্যিই এক সময় ঘণ্টা বেজে উঠল।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। **প্রকাশস্থান** ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

২। **প্রকাশকাল** মাসিক

৩। **প্রকাশক ও মুদ্রাকর** অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

৪। **সম্পাদক** অশোককুমার সরকার, ভারতীয় নাগরিক, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

৫। **যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা:**

(ক) **মালিক** আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

(খ) **মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা** অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অর্শানকুমার সরকারের পক্ষে অলকা সরকার। ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

আমি অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

মার্চ ১, ১৯৭৬ **প্রকাশক**

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "কে, বেণু? তুমি এসেছ?"

ঘণ্টা বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "বেণু, তোমার ছেলে তোমায় ডেকেছে। সে তোমার আদেশ চায়—। তোমাদের মনের ইচ্ছে তাকে জানাও..."

তারাপদ আত্মার আবির্ভাব, ঘণ্টা বাজানোর দিকে মন দিল না, ভুজঙ্গর কথাতেও নয়। খুব সাবধানে নিজের বাঁ পা দিয়ে মেয়েটির ডান পায়ের ফেলে-রাখা নকল ফাঁপা পাতা আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগল। যে কোনো সময়ে এই চালাকি মেয়েটি বুঝে ফেলতে পারে। ভয় করছিল তারাপদর, শুধু সাবধানে সে তার কাজ করে যাচ্ছিল। এর আগে চন্দনও একদিন ঘণ্টা বাজানোর রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল, কিকিরার কথামতন। মাফলার থেকে ছিঁড়ে আনা সাদা উলের টুকরো ঘণ্টার পাশে ফেলে রেখেছিল। ধরবার চেষ্টা করছিল ঘণ্টাটা কেউ তুলে নিয়ে বাজায় কিনা? মানুষেই হোক অথবা ভূতেই হোক, ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজানোর পর আবার যখন রাখবে—তখন একটুও নড়চড় হবে না, উলের টুকরোর ঠিক পাশেই থাকবে—এটা হতে পারে না। চন্দন দেখেছিল, ঘণ্টা আর উলের টুকরো ঠিক জায়গাতেই আছে। তখন থেকেই চন্দনের সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই তুচ্ছ একটা প্রমাণ প্রমাণই নয়, আরও বড় প্রমাণ চাই।

ভুজঙ্গ আত্মা নামিয়ে যাচ্ছেন। বেণু গেল, বিষ্ণু এল। কথা বলছেন ভুজঙ্গ। তারাপদ ততক্ষণে তার কাজ সেরে ফেলেছে। বাজাক—টেবিলের তলায় গোপনে ঝুলিয়ে রাখা ঘণ্টা যত খুশি বাজাক মেয়েটি— কিছু আসে যায় না তারাপদর।

আত্মারা শেষ পর্যন্ত বিদায় নিল। তারাপদ নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল, এবার মেয়েটি পা নামাবে, নামিয়ে তার নকল পায়ের পাতা খুঁজবে।

তারাপদ বুঝতে পারছিল মেয়েটি পা নামিয়েছে, পায়ের পাতা খুঁজছে। তার পা নড়ছে, শাড়িও নড়ছে। ঠিক জায়গায় নকল জিনিসটি না পেয়ে পা দিয়েই যেন চারদিক খুঁজছে, অন্ধকারে আমরা যেভাবে পায়ের চটি খুঁজি।

মেয়েটির হাতের আঙুলের ওপর সামান্য চাপ দেবার চেষ্টা করল তারাপদ, বোঝাতে চাইল—তুমি ধরা পড়ে গেছ। চলে যাও।

এই বার সেই ক্ষীণ বাতি জ্বলল। আত্মারা চলে যাবার সামান্য পরে যেমন রোজই বাতি জ্বলে ওঠে। মেয়েটি তারাপদর মুখের দিকে তাকাল। তার ফরসা মুখে ভয় ও বিস্ময়। চোখের পাতা পড়ল না মেয়েটির। কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি উঠে পড়ল। তারাপদর মনে হল, ভুজঙ্গকে বলে দেবে।

মেয়েটি কিছু বলল না। মুখ নিচু করে অন্য দিনের মতন ভুজঙ্গর পাশ দিয়ে চলে গেল।

তারাপদর এবার সত্যি সত্যিই বুক কাঁপছিল।

ভুজঙ্গ বললেন, "তোমার আর কিছু বলার আছে, তারাপদ?"

কথার জবাব দেবার আগে তারাপদ প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। শেষে বলল, "না। আর কিছু নেই।" একটু থেমে আবার বলল, "পিসেমশাই, পরীকে আজ আর-একবার দেখতে পাব না?"

ভুজঙ্গ যেন বিরক্তই হলেন, বললেন, "তোমায় আমি

বারবার বলেছি—আত্মাদের যখন-তখন খেয়াল-খুশি মতন ডাকতে নেই। তাতে তাঁদের কষ্ট হয়।"

তারাপদ মনে মনে বুঝতে পারল, ভুজঙ্গ কেন বারবার পরীকে আনতে চান না। ধরা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। যতই চালাকি করে শিখিয়ে পড়িয়ে, কায়দা কানুন করে পরীর নাম দেখিয়ে ওই মেয়েটিকে আনা হোক না কেন—তবু ঘণ্টা বাজানোর চেয়ে ওই ব্যাপারটা কঠিন। সামান্য ভুলচুক হলেই ধরা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে যে-কোনো মানুষের পক্ষে আসা, আর ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো মুশকিল। তার চেয়েও মুশকিল হল, একেবারে গায়ের সামনে এসে দাঁড়ানো—রুমালে মাখানো সেন্টের গন্ধ নাকের কাছে ধরা, খুব আলগা করে মাথার ছড়ানো চুলের ছোঁয়া দিয়ে যাওয়া। কাল তারাপদকে এইভাবে ঠকানো হয়েছে। যদি ওই মেয়েটি সামান্য ভুলচুক করত—তারাপদর গায়ে এসে পড়ত। হয়ত তারাপদ তখন উত্তেজনার মাথায় হাত বাড়িয়ে পরীকে ধরতে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলত।

ভুজঙ্গ চতুর লোক। ঝুঁকি নিতে বারবার রাজী হবে না।

কিন্তু তেমন একটা বড় ঝুঁকি কি ভুজঙ্গ নেয়? কিকিরা বলেছেন এই সশরীরে আত্মা আসার ব্যাপারটা ব্ল্যাক' ম্যাজিকের মতন। এখানে একটু অন্যরকম চালাকি করতে হয়। অন্ধকারে দেখা যাবার একরকম দূরবীন আছে। যুদ্ধের সময় রাত্রে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শত্রুরা গুলি ছুঁড়তে পারে ভেবে অন্ধকার দেখার জন্যে সৈনিকরা এই দূরবীন ব্যবহার করে। একে বলে স্নাইপারস্কোপ। পরীর বেশে যখন মেয়েটি এসেছিল—তখন তার হাতে ওই দূরবীন ছিল, ছোট ধরনের। কাজেই এই অন্ধকারে সে সবই দেখতে পাচ্ছিল। কোনো অসুবিধে তার হয়নি।

তবু কখনো কখনো এ-সব কাজে ভুল হয়ে যায়। ভুজঙ্গ খুব সাবধানী।

তারাপদ বলল, "আমি তাহলে উঠি?"

ভুজঙ্গ বললেন, "তুমি মনঃস্থির করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি রাজী?"

"রাজী।"

"আমার সমস্ত শর্ত মানছ?"

"মানছি।"

"খুশী হলাম, তারাপদ। তোমায় আমি আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি।" বলে ভুজঙ্গ একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, "ঘণ্টাটা আমার কাছে দিয়ে যাও।"

তারাপদ ঘণ্টাটা তুলে নিল। তার চেয়ারের পেছন দিকে পায়ের নকল পাতা পড়ে আছে। ভুজঙ্গর দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ভুজঙ্গভূষণের পায়ের কাছে ঘণ্টাটা নামিয়ে তারাপদ দাঁড়িয়ে থাকল।

ভুজঙ্গভূষণ হাত নেড়ে ইশারায় তারাপদকে তার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বললেন। ফিরে এল তারাপদ।

ঘণ্টাটা বাজালেন ভুজঙ্গ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় এসে দাঁড়াল। নিচু গলায় কিছু যেন বললেন ভুজঙ্গ। মৃত্যুঞ্জয় চলে গেল।

সামান্য সময় একেবারে চুপচাপ। শেষে ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তারাপদ, আমাদের পালনীয় কিছু আচার আছে, নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। আজ তোমায় তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। কাল সকালে মৃত্যুঞ্জয় তোমাকে যেমন-যেমন বলবে—তুমি সেইভাবে কাজ করবে। আজ আর তোমায় আমি বসিয়ে রাখব না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমার সমস্ত শর্ত মেনে কাজ করলে এই আসনের তুমি হবে একমাত্র উত্তরাধিকারী। যদি প্রবঞ্চনা করো, ছলনা করো—তবে তার শাস্তি কত ভয়ংকর হবে তুমি জান না।"

তারাপদকে কথা বলার কোনো সুযোগ না-দিয়েই ভুজঙ্গ ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। নিকষ কালো অন্ধকার।

সেই অন্ধকার যেন এবার পাতালের অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল। থমথম করছে সব, স্তব্ধ। আচমকা ভুজঙ্গভূষণের গলা শোনা গেল, বজ্রগম্ভীর। "আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলে তোমার কী হবে তুমি জানো না। সামনে তাকাও। দেখো।"

ভুজঙ্গর কথা শেষ হবার আগেই ঘরের মাথার দিকে ক্ষীণ একটা আলো জ্বলে উঠল। তারাপদ মাথা তুলে আলোটা দেখবার চেষ্টা করে মুখ নামাতেই ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

ঘরের মাঝখানে একটা রক্তাক্ত মুণ্ডু ঝুলছে। শরীর হিম হয়ে গেল তারাপদর। মাথা ঘুরতে লাগল। দু হাতে চোখ ঢাকল।

সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাস্য হেসে উঠলেন ভুজঙ্গ। সেই হাসি যেন ঘরের বাতাসে ঘূর্ণির মতন পাক খেতে লাগল। অসহ্য। একেবারেই অসহ্য। চোখ ছেড়ে দিয়ে দু হাতে কান চেপে ধরল তারাপদ। আবার তাকাল। দেখল মুণ্ড নয়, একটা মাথার খুলি, টকটকে লাল রক্তে যেন চোবানো। তার চোখের গর্ত, মুখের হাঁ—বীভৎস। মাথার খুলিটা ঘরের একপাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত শূন্যে লাফাতে লাফাতে যাওয়া-আসা করছিল।

ভুজঙ্গভূষণ তখনও হাসছেন। তারাপদ টেবিলের ওপর মাথা রেখে বেহুঁশের মতন পড়ে থাকল।

রাত অনেক হয়েছে। বারোটা বাজতে চলল।

তারাপদদের ঘর অন্ধকার। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। বাইরে প্রচণ্ড শীত।

চন্দন আর-একটা সিগারেট শেষ করে নিচু গলায় বলল, "আর দেরি করে লাভ নেই।"

চন্দনের বিছানার একপাশে কিকিরা সেই অলেস্টার পরে, মাথায় টুপি এঁটে বসে আছেন। গলায় মাফলার। অন্ধকারে তিনজন বসে আছে। কেউ কাউকে দেখতেও পাচ্ছে না।

তারাপদ তার বিছানায়। শীতের সবরকম সাজ তার পরনে।

কিকিরা চাপা গলায় বললেন, "আরও পনেরো বিশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।"

তারাপদ বলল, "সাধুমামার দায়িত্ব আপনার।"

কিকিরা বললেন, "সাধনদার দায়িত্ব আমি ঠিক লোককে দিয়েছি। আপনি স্যার নিশ্চিন্ত থাকুন।"

চন্দন বলল, "আপনি আর আমাদের সম্মান করে আজ্ঞে-আপনি করবেন না কিকিরাবাবু, বড় লজ্জা লাগে।"

কিকিরা একটু হাসলেন, "তা হলে বলব না।"

তারাপদ বলল, "ওই মেয়েটির জন্যে আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

"ভয়ের কিছু নেই," কিকিরা ফিসফিস করে বললেন, "সাধনদা যদি বেঁচে থাকে—ওই মেয়েটিও বেঁচে থাকবে। ও হল সাধনদার ভাইঝি। ইন্দু। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছিল ও, সাধনদা ওকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন অনাথ মেয়েকে মানুষ করবেন বলে। কিন্তু ও ভুজঙ্গর চোখে পড়ল। ভুজঙ্গ ওকে হাতে পেয়ে নিজের আত্মা নামানোর কাজে লাগাচ্ছিল।"

তারাপদ বুঝতে পারছিল, মেয়েটি আজ তাকে বাঁচিয়েছে। মেয়েটি তার নকল পায়ের পাতা খোয়া যাবার কথা ভুজঙ্গকে বলে দিতে পারত। বলেনি। বলেনি, কারণ মেয়েটিও সাধুমামার কাছে সব শুনেছে।

তারাপদ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেমন শব্দ করল, বিড়বিড় করে কিছু বলল।

চন্দন বলল, "কী হল তোর?"

তারাপদ বলল, "মাঝেমাঝেই সেই মড়ার মাথা—খুলিটা আমার চোখে ভেসে উঠছে। হরিবল্। এখনও বমি আসছে।"

কিকিরা বললেন, "আপনার—তোমার নার্ভ বড় দুর্বল তারাপদ। তুমি কখনো ম্যাজিকে মেয়েদের পেট কাটা, স্টেজের ওপর কংকাল নেচে বেড়ানো দেখনি? আশ্চর্য! আমি তো তোমায় বললাম, ওটা কিছু নয়। প্রথম দিন যেভাবে তোমরা একটা রঙীন বল নাচতে দেখেছিলে, এটাও সেইভাবে নাচানো হয়েছে। সবই চালাকি। ওই খেলাটা হবার সময় মাথার ওপরে যে বাতিটা জ্বলে ওঠে—সেটা ব্ল্যাক ল্যাম্প। আর যে-বস্তুটা নাচে তার গায়ে লাগানো থাকে ল্যুমিনাস পেন্ট। পাশের ঘর থেকে কেউ একজন ওটা নাচায়। কেমন করে নাচায় তাও বলছি। তোমরা ভাল করে কিছু লক্ষ করনি। করার মনও তোমাদের ছিল না। ওই ঘরের মাথার কালো রঙ করা লম্বা তার ঝোলানো আছে। এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত। সেই তারের সঙ্গে আবার কালো রঙ করা অন্য তারে রঙীন বলই বলো আর মাথার খুলিই

বলো ঝোলানো আছে। পুলি জান? কিংবা গোল গোল চাকা! চাকার গায়ে তার জড়িয়ে এই খেলা দেখানো হয়। একটা স্ট্রেট লাইনে একদিক থেকে অন্যদিকে টেনে নেওয়া কিংবা ঢিলে করা কিছুই নয়। ঢিলে করলে ঝুলবে, টানলে উঠবে। নাথিং বাট্ পুলি সিস্টেম। পুতুল নাচের মতন ব্যাপার, তবে পুলিটাই হচ্ছে এখানে আসল। আর ওই ব্ল্যাক ল্যাম্প। দুটো পুলি দিয়ে এ-কাজ করতে হয়। পাশের ঘরে বসে ভুজঙ্গর কোনো চেলা এই ভূতের নাচ দেখায়।"

তারাপদ অত বুঝল না। তবে বুঝতে পারল, ঘণ্টা বাজানোর মতন এও একটা ধাপ্পা, ধোঁকা।

চন্দন দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে দু মিনিট। ঘড়িটা দেখাল কিকিরাকে।

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "ডায়নামো দশটার পর বন্ধ হয়ে গেছে। আর চলবে না?"

"না," চন্দন বলল, "সে-ব্যবস্থা আমি করেছি। খারাপ হয়ে গেছে।"

"বেশ। তা হলে—তারাপদ থাকবে আস্তাবলে, গাড়িতে ঘোড়া জোতা থাকবে। রামবিলাস থাকবে। সাধনদা, ইন্দু আর তারাপদ গাড়ি করে পালাবে।" বলতে বলতে কিকিরা তাঁর লুকোনো ছোট টর্চটা বার করে নিয়ে জ্বালালেন একবার। নিবিয়ে দিলেন আবার।

"ফটক?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"খোলা আছে," কিকিরা মুচকি হাসলেন। "এই বাড়িতে যারা থাকে তারা সকলেই ভুজঙ্গ নয়। দায়ে পড়ে থাকে। ভয়ে। দু-চারজন ভাল লোকও আছে যারা এই পাপের রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তারাপদ। সাধনদার মতনই তারা একদিন এসে পড়েছিল, হয় কিছু পাবার আশায়, না হয় পেটের দায়ে। তারপর আর ফিরে যেতে পারেনি। মৃত্যু ছাড়া তাদের মুক্তি ছিল না। ওরাই আজ আমাদের সহায়, বন্ধু। নয়ত আমি কেমন করে এখানে এলাম বলো?"

তারাপদ কিছু বলল না। কিকিরা বিচিত্র মানুষ। এই লোকটির আসল পরিচয় আজও জানা গেল না।

বারোটা বাজতেই চন্দন উঠে দাঁড়াল।

কিকিরাও ধীরে সুস্থে উঠলেন। টর্চ জ্বালালেন। বললেন, "আমার পকেটে দু বোতল পেট্রল আছে। ভুজঙ্গ শয়তানের আত্মার ঘর তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।...তুমি একটা-কিছু নাও চন্দন। কিছু নেই?"

চন্দন পকেট থেকে পাতলা সরু ছুরিটা বার করল। বলল, "আপনি চলুন।"

তিন জনেই দাঁড়াল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

তারাপদ চন্দনকে বলল, "তোরা আগুন লাগিয়েই পালিয়ে আসবি। আমরা বাইরে থাকব।"

কিকিরা বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমরা আসব। তোমরা সাবধানে থেকো।"

ফটকের বাইরে সামান্য তফাত থেকে তারাপদ দেখল, ভুজঙ্গভূষণের দোতলায় আগুন জ্বলে উঠেছে। শীতের বাতাসে দেখতে দেখতে দাউদাউ করে আগুনটা যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল। দমকা হাওয়ায় আগুনের শিখা যেন ঝাপটা মারছে, আকাশের দিকে লকলক করে উঠে যাচ্ছে, তারপর ধোঁয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। চারদিকের জমাট অন্ধকার আলো হয়ে উঠল। ভীত, ত্রস্ত মানুষের কলরব। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ভুজঙ্গভূষণের বাড়ির চারদিক।

তারাপদ হঠাৎ কেমন আনন্দ অনুভব করল। প্রতিহিংসার আনন্দ। একজন শয়তানের সর্বনাশ হবার আনন্দ। তার পরই সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। চন্দনের জন্যে, কিকিরার জন্যে। ওরা কোথায়?

একটু পরেই চন্দনকে দেখতে পেল। বাগান দিয়ে প্রাণপণে ছুটে আসছে।

কিকিরা! কিকিরা কোথায়?

চন্দন ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যাবার পর তারাপদ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। পরনে লাল গেরুয়ার বস্ত্র, গায়ে চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে ব্যান্ডেজ এক উন্মাদ ছুটে আসছে। হাতে তার খড়্গ। চোখে বুঝি দেখতে পাচ্ছে না। তবু ছুটে আসছে। গায়ের চাদরে আগুন জ্বলছে। চাদরটা ফেলে দিল ও। নগ্ন গা।

তারাপদ চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "চাঁদু—চাঁদু—চাঁদু, আমরা এখানে।"

চন্দন মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। দেখল। তারপর ছুটতে ছুটতে গাড়ির কাছে এসে পড়ল।

চন্দন হাঁপাচ্ছিল।

"কিকিরা কোথায়?" তারাপদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

চন্দন আগুনের দিকে তাকাল। সমস্ত বাড়িতেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কী ভীষণ কোলাহল হচ্ছে ও দিকে।

"কিকিরা কোথায়?" তারাপদ আবার বলল।

"আমরা একসঙ্গে ঘরে আগুন দিই। তারপর আর তাঁকে দেখিনি। কোথায় যে ছুটে চলে গেলেন।"

তারাপদ বিহ্বল হয়ে পড়ল। এখন কী করা যাবে? সেই উন্মাদ ততক্ষণে ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের খড়্গ উঁচু হয়ে আছে। আগুনের আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। চারদিকে পাগলের মতন তাকাচ্ছে। ও যে ভুজঙ্গ, বুঝতে কষ্ট হয় না। তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গ আমাদের খুঁজছে। কী করব?"

কম্বল মুড়ি দিয়ে সাধুমামা ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বসে ছিলেন। তাঁর পাশে ইন্দু। কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা। সে থরথর করে কাঁপছিল।

সাধুমামা বললেন, "গাড়িটাকে আরও একটু আড়ালে নিয়ে যেতে বলি।"

গাড়ির কোচোয়ানকে সাধুমামা কী যেন বললেন। কোচোয়ান হাতের লাগাম টেনে ঘোড়ার গাড়িটাকে আরও আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ভুজঙ্গর লোকেরা দু-একজন প্রাণ বাঁচাতে বাগানে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কিকিরা কোথায়?

সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন কত দীর্ঘ! তারাপদ অস্থির হয়ে পড়ছিল, চন্দন বুঝতে পারছিল না তার কী করার আছে।

তারাপদ ব্যাকুল হয়ে বলল, "সাধুমামা, আমরা কী করব?"

সাধুমামা বললেন, "ভুজঙ্গর বাড়িতে বন্দুক আছে। মৃত্যুঞ্জয় বন্দুক চালাতে পারে। সেও যদি এসে পড়ে আমরা বিপদে পড়ব।"

"কিন্তু কিকিরা?"

সাধুমামাও কিছু বলতে পারলেন না।

ভুজঙ্গ যেন কিছু অনুমান করে আরও কয়েক পা

এগিয়ে এলেন। হঠাৎ চন্দন বলল, "কিকিরা!"

কিকিরাকে বাগানের কাছে দেখা গেল। প্রাণপণে ছুটে আসার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বাগানের লোকগুলো চিৎকার করে উঠল। কিকিরার ওভারকোটটা গায়ে নেই। হাতে। আগুন জ্বলছে কোটটায় দাউ দাউ করে। কিকিরা সেই কোটটাকেই আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে লাঠি ঘোরানোর মতন চারপাশে ঘোরাচ্ছেন।

ভুজঙ্গ কিন্তু দেখতে পেয়ে গিয়েছেন কিকিরাকে। ছুটে গেলেন। মাথার ওপর খাঁড়া তুলে।

তারাপদ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। চন্দন কেমন আর্তনাদ করে উঠল।

আবার যখন চোখ খুলল তারাপদ, দেখল ভুজঙ্গর খাঁড়া কিকিরার মাথার ওপর। কিকিরা কোটটা ঘোরাচ্ছেন। আগুনের হলকায় খাঁড়া ঝকঝক করে উঠল। ভুজঙ্গর খাঁড়া পড়ল। কিকিরার মাথাতেই পড়ার কথা। কিন্তু কেমন করে যেন সরে গেলেন কিকিরা, খাঁড়ার কোপ থেকে নিজেকে বাঁচালেন। ভুজঙ্গ ক্ষিপ্ত হয়ে আবার কিকিরার শরীর লক্ষ করে খাঁড়া তুললেন। তারাপদ বুঝতে পারছিল, কিকিরার হাত দুর্বল। এতক্ষণ তিনি নিজেকে ভাগ্যের জোরে সামলেছেন—আর পারবেন না। চোখের সামনে মানুষটা মরবে।

পারলেন না কিকিরা, জ্বলন্ত কোটটা খাঁড়ায় জড়িয়ে গেল। ভুজঙ্গ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন কোটটা ফেলে দেবার। কিকিরাও সেই ফাঁকে ছুটতে শুরু করেছেন।

কোচোয়ান রামবিলাস বলল, "সামালকে বসুন বাবুরা। জান বাঁচান।" বলতে বলতে রামবিলাস তার ঘোড়াকে হঠাৎ ঘুরিয়ে নিল ফটকের দিকে। তারপর চাবুক কষাল।

আচমকা চাবুক খেয়ে ঘোড়া লাফ মেরে উঠল। তারপরই সামনের দিকে ছুটল।

কিকিরার কোটের আগুন ভুজঙ্গর কাপড়ে লেগে গিয়েছিল। তিনি ওই অবস্থাতেই ছুটে আসছিলেন. হাতের খাঁড়া থেকে কোটটা মাটিতে পড়ে গেছে।

রামবিলাস কোনো দিকে তাকাল না, সোজা ভুজঙ্গর দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

তারাপদ পলকের জন্যে দেখল ভুজঙ্গ খাঁড়া তুললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা তাঁর সামনে লাফ মেরে, ভুজঙ্গকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ফটক পর্যন্ত ছুটে গেল।

রামবিলাস ফটকের কাছ থেকে আবার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল। ফেরার সময় দেখল ভুজঙ্গ মাটিতে পড়ে আছেন। উপুড় হয়ে। তার খাঁড়া একদিকে, তিনি অন্যদিকে। কাপড়ের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

কিকিরাকে গাড়িতে তুলে নিল রামবিলাস।

তারাপদ বলল, "আপনি এত দেরি করলেন কেন?"

কিকিরার কথা বলার শক্তি ছিল না। হাঁপাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজছিলাম। ভুজঙ্গর ঘরে সিন্দুক খুলে সে পাগলের মতন টাকাপয়সা সোনাদানা হাতড়াচ্ছিল। তাকে ঘরের মধ্যেই বন্ধ করে রেখে এলাম। জানলা দিয়ে লাফানো ছাড়া তার আর উপায় নেই।"

ভুজঙ্গর বাড়ি ছেড়ে গাড়িটা অনেক দূর চলে এল। এখনও দূরে তাকালে আকাশের একটা দিক লাল দেখায়। অথচ আশপাশে মাঠ আর ঝোপঝাড়ে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। শীতের বাতাস বইছে শনশন করে. ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ আর খুরের আওয়াজ উঠছে খটখট।

সাধুমামা বসে থাকতে-থাকতে কেঁদে উঠলেন।

কিকিরা প্রথমে কিছু বললেন না, পরে বললেন. "সাধনদা, তুমি কাঁদছ কেন? আজ এতকাল পরে তোমার মুক্তি হল।"

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সাধুমামা কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল। তারাপদর বাবাকে আমিই এনেছিলাম।"

কিকিরা বললেন, "তারাপদকেও তুমি এনেছ। ভুজঙ্গকে শেষ করবে বলে তুমি ধীরে-ধীরে ধৈর্য ধরে শতকাল ধরে জাল ছড়িয়েছ সাধনদা। সেই জালে একে-একে সবাই জড়িয়ে পড়েছে।"

সাধুমামা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "না না, আমার কিসের সাধ্য। তুমিই তো করলে সব। তোমার ও কত ক্ষতি করেছিল আমি জানি।"

চন্দন জিজ্ঞেস করল, "কিকিরাবাবু, আপনি কে? আপনার সত্যিকারের পরিচয়টা জানতে পারি?"

কিকিরা তাঁর আগুনে-ঝলসানো হাত সামলাচ্ছিলেন মনের জোরে। যন্ত্রণার শব্দও করছিলেন মাঝে মাঝে। বললেন, "আমি সাধনদার বন্ধু। কিঙ্করও বলতে পার। সাধনদা আমায় কলকাতায় খবর দিয়েছিল তোমরা শংকরপুরে আসছ।" বলে একটু থেমে কিকিরা আবার বললেন. "সলিসিটার মৃণাল দত্তর বাড়িতে যে বুড়ো মতন লোকটিকে তোমরা দেখেছ, সে আমাদের লোক। আমরা তাকে মধুপুর থেকেই সলিসিটার দত্তর বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম কাজে লাগাব বলে।"

তারাপদ চুপ করে ছিল। খানিক পরে বলল. "আপনি সত্যি সত্যি কে—আমরা জানি না। কিন্তু আপনার দয়াতেই আমরা বাঁচলাম।"

কিকিরা বললেন, "অতশত জানি না বাবা, তবে এটুকু জানি—তুমি যদি একবার ভুজঙ্গর ফাঁদে পা দিতে তুমিও ভুজঙ্গ হয়ে যেতে। পাপের পথ, লোভের পথ—মানুষ যদি একবার ধরে, সে আর সহজে ছেড়ে আসতে পারে না। দেড় দু লক্ষ টাকার সম্পত্তির লোভ থেকে তুমি বেঁচেছ।"

তারাপদ মনে মনে বলল, হ্যাঁ, সে বেঁচেছে। বেঁচে গিয়েছে। (শেষ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

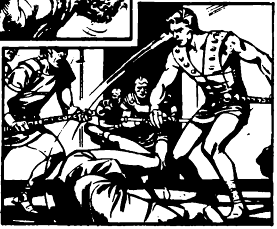

বহু শতাব্দী এগিয়ে

১লা মার্চ ১৯৭৬

এক সময় ধাঁধাঁয় আটকে পড়েছে ফ্ল্যাশ ও জারকভ। এক বিরাট মহাকাশের যুদ্ধ জাহাজ ওদের বাধ্য করে ওর ওপর নামতে। ওরা চিনতে পারে এই জাহাজে ওরা আগেও একবার এসেছিল। ওরা খুঁজে পায় একমাত্র যাত্রী এণ্টাকে— যে এখন ঘুমন্ত মিউট্যাণ্ট। এণ্টাকে জাগাতেই সে হয়ে উঠল এক মারণযন্ত্র। মিউট্যাণ্টরা ফ্ল্যাশ ও জারকভকে বন্দী করে এনেছে "মন-সন্ধানী" রিসার্চের জন্য। ওরা কি মেনে নেবে? না নিলে আর কি উপায় আছে ওদের?

ভবিষ্যতের পটভূমিকায় লেখা এই আশ্চর্য মহাকাশ কাহিনী রহস্য ও রোমাঞ্চে ঠাসা। আসছে ইন্দ্রজাল কমিকসের ১লা মার্চ ১৯৭৬ সংখ্যায়।

ইন্দ্রজাল কমিকস্

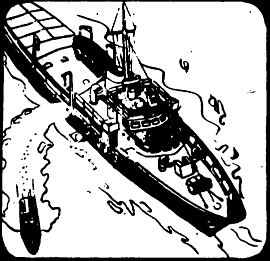

দানবের সেনা

১৫ ই মার্চ ১৯৭৬

ডেনকালিতে খনি খোঁড়ার যে অধিকার পত্র বেতাল দেয়নি, তাই ভয় দেখিয়ে ব্যাণ্ডার সর্দার গুরাণের কাছ থেকে দখল করে নিল জলদস্যু গোল্ডবিয়ার্ড। ক্রুদ্ধ বেতাল গোল্ডবিয়ার্ডের জাহাজ ধ্বংস করে দিল। জলদস্যু প্রতিশোধ নিল খুলিগুহার ভেতরে বোমা ফাটিয়ে—বোমার মধ্যে স্নায়ুগ্যাস্। ওর বাছাই করা খুনীর দল আদেশ পেয়েছে বেতালকে যে করেই হোক শেষ করতে হবে। কি লেখা আছে বেতালের ভাগ্যে?

জানতে চান তো আসুন— ইন্দ্রজাল কমিকসের ১৫ ই মার্চ ১৯৭৬ সংখ্যাটি পড়া যাক্।

মূল্যঃ ১ টাকা

ইউরেকা! ইউরেকা!

মঞ্জু দাশগুপ্ত

কী সুন্দর মুকুট। যেমন সোনার রং তেমনই তার কারুকার্য। চোখ ফেরানোই যায় না। মুগ্ধ হয়ে রাজা হেয়রো মুকুটটার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। কত কথা ভাবছিলেন। ভূমধ্যসাগরের ছোট একটা দ্বীপ সিসিলি, তার একটা শহর সিরাকিউজ, তার রাজা তিনি। পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের বড়ো বড়ো সম্রাটদেরও বুঝি এত সুন্দর মুকুট নেই।

মকুটটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাজা হেয়রোর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, মুকুটটা পুরো সোনার তো? নাকি অন্য কোনও ধাতুর মিশেল আছে?

যে স্বর্ণকার মুকুটটা বানিয়েছিল সে হলফ করে বলল, না, রাজামশায়। এতে কোনও মিশেল নেই। ওজন করে দেখুন, ঠিক যতটা সোনা আপনি দিয়েছিলেন মুকুটের ওজন ঠিক ততটাই। ওজনে কোথাও এক রত্তি এধারওধার নেই।

তবু রাজার সন্দেহ যায় না। এদিকে সন্দেহ দূর করতে হলে মুকুটটা ভেঙে গালিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু তাহলে যে এত সুন্দর মুকুটটা নষ্ট হয়ে যায়।

তখন রাজা হেয়রো ডেকে পাঠালেন আর্কিমেডেসকে। বললেন, "দেখুন, আর্কিমেডেস, বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী বলে দেশ-জোড়া আপনার নাম। এই যে

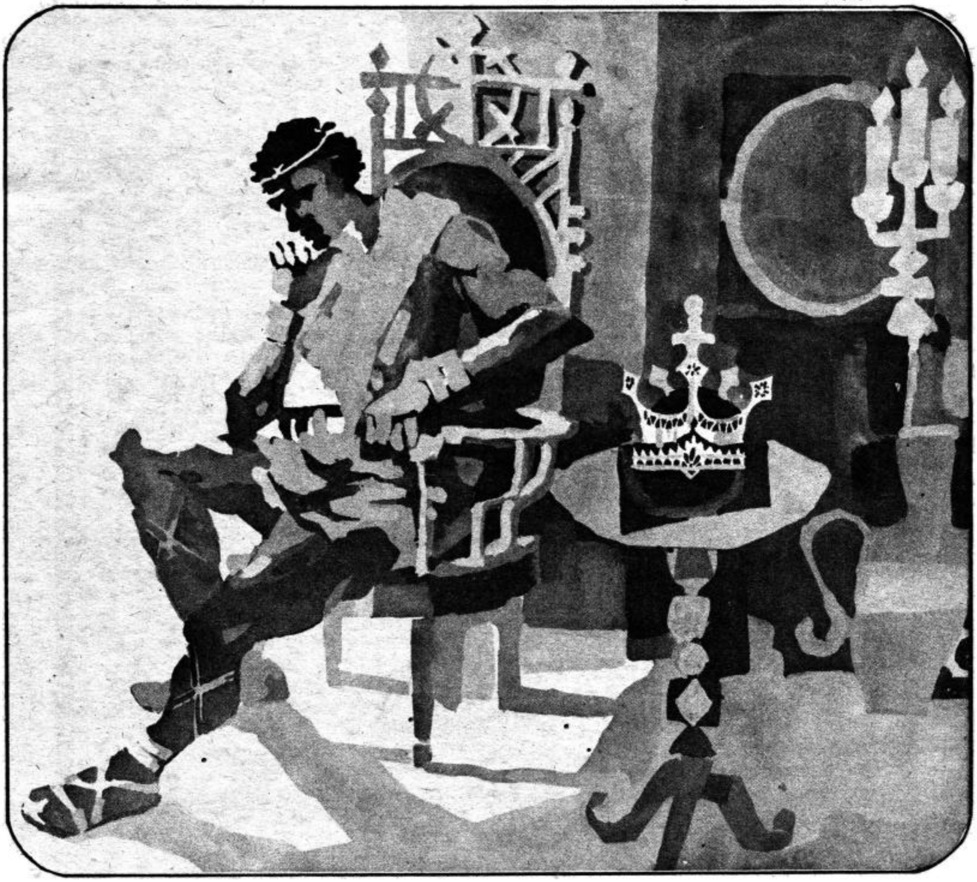

মুকুটটা দেখছেন—বলুন তো এর সবটাই সোনা কিনা!"

আর্কিমেডেস পড়লেন মহা মুশকিলে। মুকুটটা ঠিক যেমনকার তেমনই রেখে কী করে বলবেন যে এর সবটাই সোনা, নাকি এতে অন্য কোনও ধাতু আছে! অন্য ধাতু মিশিয়ে ওজন ঠিক রাখা কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়।

আর্কিমেডেস রাত্তির-দিন ভাবতে লাগলেন। ভেবে ভেবে কূলকিনারা পান না। মুকুটের সবটাই সোনা, নাকি তাতে অন্য ধাতুও এমন কায়দাতে মেশানো হয়েছে যে, ওজন করে কি চোখে দেখে কিছুতেই আসল ব্যাপারটা বলা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে একদিন আর্কিমেডেস স্নান করতে এসেছেন শহরের পাবলিক বাথ-এ। এখানে বড়ো বড়ো চৌবাচ্চাতে স্নানের জল থাকে। শহরের ভদ্রলোকেরা এসব চৌবাচ্চাতে এসে স্নান করেন।

জামাকাপড় খুলে আর্কিমেডেস অন্যমনস্ক ভাবে নামলেন একটা চৌবাচ্চাতে। সেই চৌবাচ্চাটায় জল একেবারে কানায় কানায় ভরা ছিল। তিনি নামতেই চৌবাচ্চার খানিকটা জল কানা ছাপিয়ে বাইরে পড়ে গেল। এতটা জল উপচে পড়ল কেন?

ব্যস, বিদ্যুৎ খেলে গেল আর্কিমেডেসের মাথায়। এই তো পেয়েছেন সমস্যার সমাধান। আনন্দে দিশেহারা হয়ে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করতে করতে বাড়ি ছুটলেন। উত্তেজনার চোটে জামাকাপড় পরতে ভুলেই গেলেন। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে রাস্তার লোকেরা তো হাঁ।

এখানে বলে রাখি, গ্রীক ভাষাতে 'ইউরেকা' শব্দটার অর্থ হলো 'পেয়েছি'। শহরবাসীদের স্নানাগারে স্নান করতে নেমে কী জিনিস পেলেন যে, আর্কিমেডেসের মতো গণ্যমান্য নাগরিক জামাকাপড় না পরে 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলতে বলতে ছুটে বাড়ি গেলেন?

আসলে রাজা হেয়রো তাঁকে যে সমস্যাটা দিয়েছিলেন সেটার সমাধান আর্কিমেডেস কানায় কানায় ভরা চৌবাচ্চাতে নেমেই পেয়েছিলেন।

ধরা যাক এক তাল সোনার ওজন আধ কিলো। তার পাশেই রাখা হলো আধ কিলো ওজনের রুপোর একটা তাল। সোনা অনেক ভারী ধাতু বলে সোনার তালটা রুপোর তালের চাইতে অনেক ছোট। যদি কানায় কানায় জল ভরা দুটো পাত্রের একটিতে সোনার তাল আর অন্যটিতে রুপোর তাল ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কী হবে? সোনার তালটা তুলনায় ছোট বলে সেটার পাত্র থেকে অল্প জল, আর একই কারণে রুপোর তালের পাত্র থেকে তুলনায় বেশী জল উপচে পড়বে।

তার মানে ওজন এক হলেও প্রত্যেকটা জিনিস নিজের আকার অনুসারে জায়গা দখল করে, আর যেটার জায়গা দখল করে সেটাকে—জলের জায়গা দখল করলে জলকে—নিজের আকার অনুসারেই সরিয়ে দেয়। এই কথাটাই আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে আর্কিমেডেসের মাথায় খেলে গিয়েছিল সেই চৌবাচ্চা থেকে জল উপচে পড়া দেখে।

এইবার আর্কিমেডেস তাঁর পরীক্ষা দেখালেন রাজা হেয়রোকে। মুকুটের যা ওজন ঠিক সেই ওজনের এক তাল সোনা নিলেন। তার পর কানায় কানায় জল ভরা একটি পাত্রে সোনার মুকুটটা আর অন্য একটি পাত্রে সোনার তালটা ফেলে দিলেন। মুকুটের পাত্র থেকে জল একটু বেশীই উপচে পড়ল।

আর্কিমেডেসের বুঝতে বাকি থাকল না, মুকুটে এমন কোনও ধাতু মেশানো হয়েছে যা সোনার চাইতে হালকা। মেশানো ধাতুটা ওজনে হালকা বলেই আকারে বেশী জায়গা নিয়েছে। মুকুটটা শুধুই সোনার হলে জায়গা কম নিত, ওই সোনার তালটা যতখানি জায়গা নিয়েছে ঠিক ততটাই নিত।

এভাবে স্বর্ণকারের ফাঁকিবাজি ধরে ফেললেন আর্কিমেডেস। রাজা হেয়রো বেজায় খুশী হলেন। ভাগ্যিস, স্বর্ণকার ওই রকম একটা চালাকি করেছিল। তাই তো অতদিন আগে বস্তুর আয়তন সম্বন্ধে এমন একটা সূত্র আর্কিমেডেস মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

এখন একটা মুকুটের ওজন আর আয়তনের সঙ্গে জলের যদি এইরকম সম্পর্ক হয় তাহলে ব্যাপারটাকে তো আরও তলিয়ে দেখতে হচ্ছে।

ধরা যাক এক গামলা জল আছে। যদ্দুর পর্যন্ত জল আছে সেখানে একটা দাগ দিয়ে জলের উচ্চতা চিহ্নিত করে রাখলাম। এবার গামলার জলে ভাসিয়ে দিলাম একটা বাটি। গামলার গায়ে আগের চিহ্ন ছাড়িয়ে জলটা উঁচু হয়ে উঠল। বাটিটাকে জলের ভেতরে এমন ভাবে আরও চেপে ধরলাম যাতে কানা ছাপিয়ে বাটিতে জল না ঢুকে পড়ে। গামলায় জল আরও ফেঁপে উঠল। এবার বাটিটাকে চেপে ধরে ডুবিয়ে দিলাম জলে। দেখতে পাচ্ছি, জলের সীমানা আবার সেই প্রথম চিহ্নের কাছে নেমে এল।

এভাবে আর্কিমেডেস একটা নতুন বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের পথ খুলে দেন। এই নতুন বিষয়টাকে হাইড্রোস্ট্যাটিক্স বলে। বাংলায় বলতে পারি জল-বিষয়ক জ্ঞান। এতে কোনও জিনিসের জলে ভাসা-ডোবা আর তার ফলে জলের জায়গা ছেড়ে দেওয়া ও জায়গা দখল করার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়।

কিন্তু শুধু জল-বিষয়ক জ্ঞানের প্রথম সূত্রগুলোই আর্কিমেডেস আবিষ্কার করেননি। তাঁর আসল ঝোঁকটা ছিল নানারকম কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের দিকে। এসব জিনিসের কাজ হলো, মানুষের খাটুনিকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। অর্থাৎ অল্প খেটে বেশি খাটুনির ফল লাভ করা।

একবার রাজা হেয়রো জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, শত্রুদের জাহাজ জল থেকে তুলে নিয়ে সরানো কি সম্ভব?

আর্কিমেডেস সঙ্গে সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই সম্ভব, এমন কি পৃথিবীটাও তুলে নিয়ে সরানো সম্ভব।

উত্তর শুনে রাজা অবাক। জানতে চাইলেন, কী বলছেন?

আর্কিমেডেস উত্তর দিলেন, খুব সোজা, আমি যদি অন্য একটা গ্রহে পা রাখার জায়গা পেতাম, তাহলেই পৃথিবীটাকে এর জায়গা থেকে তুলে নিতাম।

রাজার বিশ্বাস হলো না। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাইলেন।

আর আর্কিমেডেসও তো প্রমাণ দিতেই চান। একটা কপিকলের সঙ্গে আর একটা কপিকল, তার সঙ্গে আর একটা—এভাবে তিনি কপিকলের একটা মালাই যেন গেঁথে ফেললেন। কপিকলের মালার ভিতর দিয়ে একটা শিকল গলিয়ে সেটাকে বাঁধলেন একটা মাল-বোঝাই জাহাজের সঙ্গে। তারপর শিকলটা রাজা হেয়রোর হাতে

দিয়ে বললেন, এবার টানুন।

রাজা হেয়েরো তো অল্প একটু টেনেই দারুণ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। কপিকলের ওই মালার সাহায্যে অত ভারী একটা জাহাজ কত সহজে উঠে আসছে জল থেকে। জাহাজ টেনে তোলার জন্যে কপিকলের শেকলটা একা রাজা হেয়েরোই টানতে পারছেন। অবাক তো হবেনই।

প্রকৃতপক্ষে ভারী জিনিস তোলার জন্যে কপিকলের আবিষ্কার আর্কিমেডেসের বড়ো আবিষ্কারগুলোর একটা। এখনকার কালে ব্যাপারটা খুব সোজা। কিন্তু দু হাজার বছর আগে মানুষ কপিকলের মজাটা জানত না, কপিকল কাকে বলে, কী ভাবে সেটা কাজ করে তার কিছুই সে জানত না। একবার কপিকল আবিষ্কারের পরে দেখতে-দেখতে জিনিসটার প্রচার পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ছড়িয়ে পড়ে আর তার অনুকরণও হতে থাকে।

কত বড়ো বড়ো আবিষ্কার অচল হয়ে গেছে আর তার প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু কপিকলের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন কোনও যন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। তার ফলে সে আবিষ্কারের মূল্য এখনও বজায় আছে।

আর্কিমেডেসের আর একটা বড়ো আবিষ্কার হলো জাহাজের খোল থেকে জল বের করার ব্যবস্থা। এটার জন্যে চাই একটা চোঙ আর তার ভিতরে একটা ডান্ডার গায়ে স্ক্রুয়ের মতো পেঁচানো পেঁচানো পাখনা। পেঁচানো পাখনাওয়ালা ডান্ডাটা সুদ্ধু চোঙাটা নামিয়ে দিতে হবে জাহাজের খোলে জমা জলে। ডান্ডাটার ওপরের হাতলটা ঘোরালেই ভেতরের পাখনার ধাক্কাতে নীচের জল উঠে আসবে বাইরে।

এইভাবে জল তুলে খুব অল্প পরিশ্রমে জমিতেও জল সেচ করা যায়।

আর্কিমেডেস তখনও বেঁচে। রোমানরা সিরাকিউজ আক্রমণ করল। রাজ্য রক্ষা করার জন্যে ডাক পড়ল বৃদ্ধ আর্কিমেডেসের। তিনি এমন একটা যন্ত্র বানিয়ে দিলেন যা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বড়ো বড়ো আগুনের গোলা ছোঁড়া যায়। সিরাকিউজের সৈন্যদের ছোঁড়া সেই গোলার চোটে রোমানরা প্রথম পিছু হটে গেল। পরে তারা তাদের সৈন্যবল আরও অনেক বাড়িয়ে আক্রমণ করল। বিশাল রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে সিরাকিউজের ছোট্ট সৈন্য-বাহিনী কত আর লড়বে? সিরাকিউজের পতন হলো।

রোমান সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের নাকি বলে রেখে-ছিলেন, আর্কিমেডেস নামে এক মহা জ্ঞানী ব্যক্তি ওই শহরে বাস করেন, কেউ যেন তাঁর গায়ে হাত না দেয়। কিন্তু রোমান সৈন্যরা তো আর্কিমেডেসকে চিনত না। তারা দেখল, একজন সিরাকিউজবাসী বালির উপরে কাঠির ডগা দিয়ে জ্যামিতির কী সব নকশা আঁকছেন। তারা তাঁকে তেড়ে গেলে তিনি শুধু বললেন, "আমার নকশাটা নষ্ট কোরো না। এই কথা শুনে এক রোমান সৈন্য তাঁকে তরোয়াল দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলল।

নকশা আঁকার ওই সিরাকিউজবাসী ছিলেন বৃদ্ধ আর্কিমেডেস। মৃত্যুর আগে তিনি শুধু বললেন, আঃ, আমার শরীরটাকে তোমরা পেলে, কিন্তু মনটাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। সভ্যতার প্রাচীন কালে যেসব বুদ্ধি-মান, জ্ঞানী, জিজ্ঞাসু ও আবিষ্কারক জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে আর্কিমেডেসের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে লেখা আছে খাঁটি সোনার অক্ষরে।

ছবি এঁকেছেন ॥ শৈবাল ঘোষ

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

১০ মার্চ মণিমেলা পতাকা দিবস। ঐদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মণিভাইবোনেরা মণিমেলার শিশুকল্যাণ কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করবে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষা-ব্রতী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজসেবী মণিমেলা পতাকা দিবসে সাধ্যমত অর্থসাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কল-কাতা, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা, নদীয়া ও বর্ধমান জেলা থেকে আগত তিনশত মণিভাইবোন বত্রিশটি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে কলকাতার বৈজয়ন্তী মণিমেলা। ভাইদের বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বৈজয়ন্তী মণিমেলার শ্রীবিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং বোনেদের বিভাগে ২৪ পরগনার দক্ষিণ বারাসত মণিমেলার শ্রীমতী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমেদপুর শিক্ষণ শিবিরে মণিমেলার স্বেচ্ছাসেবী শিশুকল্যাণ-কর্মীদের যে প্রাথমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা হয়ে গেল, তার ফলা-ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ৮৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অন্যূন ৫০% নম্বর পেয়ে ৫৪ জন সাধারণ বিভাগে পাশ করেছে; কমপক্ষে ৬০% নম্বর পেয়ে ২২ জন ডিস্টিংশনসহ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ৭৫% নম্বর পেয়ে দুর্গাপুরের ঝিলিমিলি মণিমেলার শ্রীঅজয় সরকার অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

মণিমেলার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব পূর্ব ঘোষিত ২২ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে আগামী ২৮ মার্চ রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদ

গত ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন মণিমেলা আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিশোর-কল্যাণ-দিবস ও ভারতের ২৭তম প্রজাতন্ত্র উৎসব যথাযথ নিষ্ঠা ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে।

মণিসন্দেশ

কলকাতার যাদবপুর কলোনি মণিমেলার ৩৪তম প্রতিষ্ঠা উৎসব আলো, সুর আর ছন্দের সমন্বয়ে এক আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রদর্শনীর মাধ্যমে পালিত হল। সভাপতির ভাষণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীঅরুণ গুপ্ত স্থানীয় অঞ্চলে শিশু ও কিশোর-কল্যাণের কাজে মণিমেলার দীর্ঘদিনের নিষ্ঠার সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

ছোটদের নাটক পরিবেশনার ক্ষেত্রে কলকাতার বৈজয়ন্তী মণিমেলা বিশেষ সুনামের অধিকারী। রবীন্দ্রসদন-মঞ্চে তাদের সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'গজমোতির মালা' মণিভাইবোনেদের অভিনয়-কৃতিত্বে ভাস্বর। নাটকটি রচনা ও পরিচালনার জন্য বিশেষ সাধুবাদ পাবেন শ্রীসূর্য সেনগুপ্ত।

বেহালার ইউনিক পার্ক মণিমেলার ঊনবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি পালিত হল নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

নৈহাটি মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়াপ্রদর্শনী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মণিভাইবোনেরা এই উপলক্ষে ড্রিল, প্যারেড, ব্রতচারী, লোকনৃত্য ইত্যাদির এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

কলকাতার কসবা মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি 'আজব দেশে অ্যালিস' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে পরিবেশন করে।

বর্ধমানের এথোড়া গ্রামের হিতৈষী মণিমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

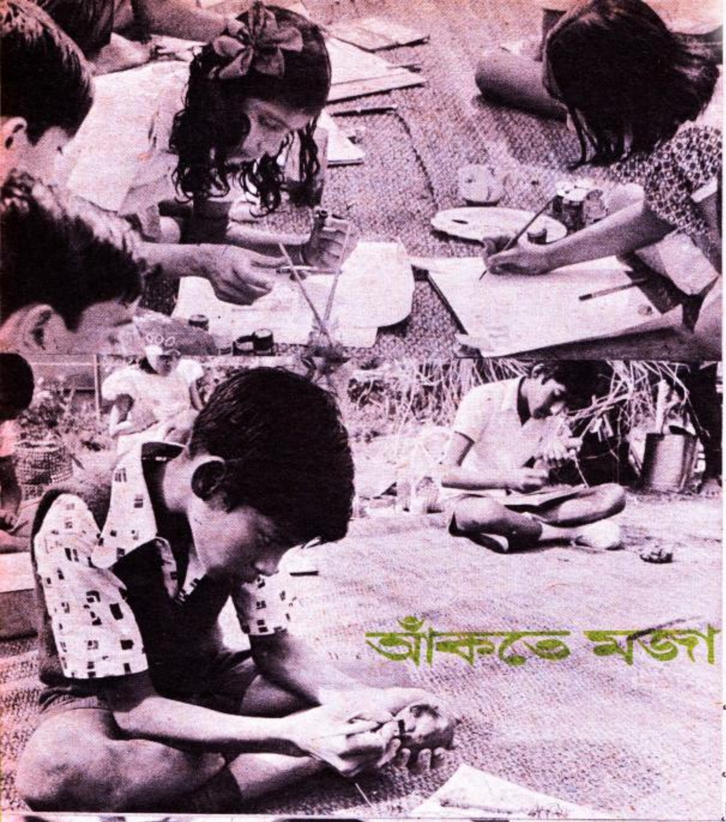

আঁকতে মজা

"বসে পড় এবং চটপট ছবি এঁকে ফেলো।" শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা কলকাতায় শুরু হয়েছিল, এখনও চলছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বিধান শিশু উদ্যানে এক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ওখানে শুধু ছবি আঁকারই প্রতিযোগিতা হল না, সেই সঙ্গে আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা কাগজের ফুল তৈরি, মাটির পুতুল গড়া, গান, হাসা-কৌতুক এসবও ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়। বিরাট মেলা। ৫ থেকে ১৪ বছরের মোট ৬০০ জন প্রতিযোগীর শিল্পসৃষ্টি। কেউ ছবি এঁকে চলে গেল গান গাইতে, আবার কেউ আবৃত্তি সেরে বসে পড়ল ছবি আঁকতে। দুটি মূক ও বধির ছেলে এক মনে গড়ছিল মাটি দিয়ে বিধানচন্দ্রের প্রতিকৃতি। ঘণ্টা পড়ে গেছে, সময় শেষ, তখনও তাদের কাজ শেষ হয়নি, তারা কারও কথা শোনে না, কাজ করে চলেছে। তাদের বাবা এসে বোঝালেন, এবার ছবি আঁকার পালা। আর কোনও কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তারা হাত ধুয়ে রেডি।

শুধু শহরেই নয়, কলকাতার আশেপাশের নানা জায়গা থেকে ঠিক তোমাদেরই মতো অল্পবয়সী শিল্পীরা এসে জমা হয়েছিল এই মেলায়। কেউ এসেছে বালি থেকে, কেউ গরিফা থেকে। কেউবা আবার পাশেরই সি আই টি স্কিম-এর বাসিন্দা।

কতরকম ছবি, কতরকম পুতুল, কতরকম কাগজের ফুল। বেপরোয়া তুলির টানে রঙ বেরঙের রচনা সৃষ্টি হল মাত্র ৪০ মিনিট সময়ে। বাহাদুরি নয়?

আলোকচিত্র : বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

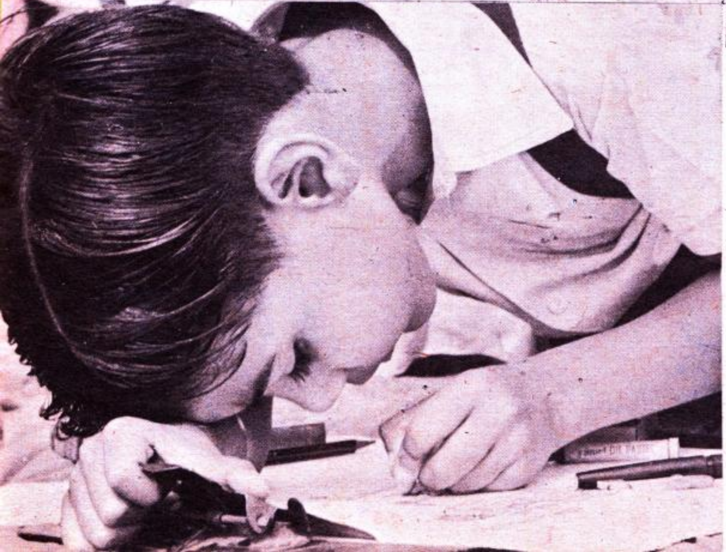

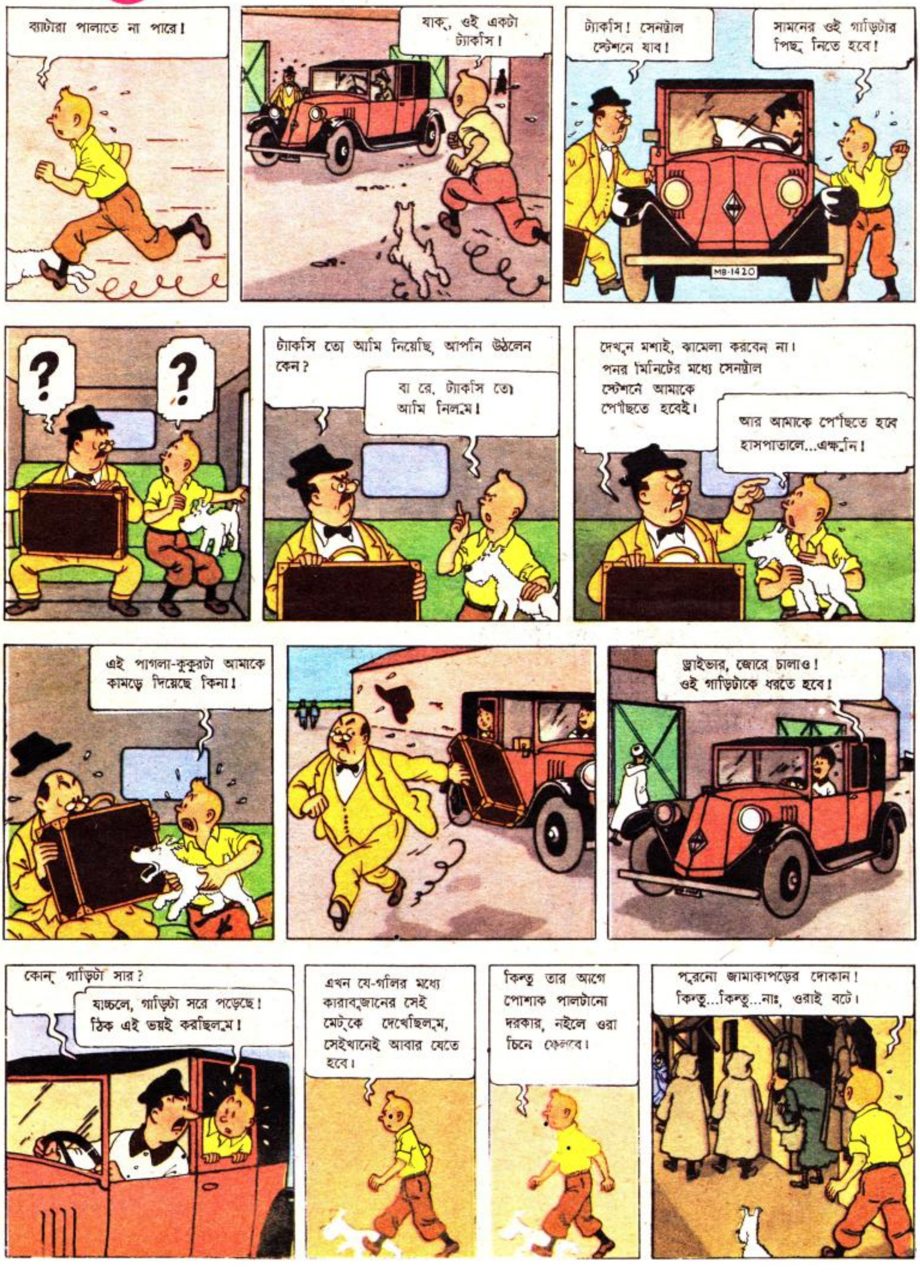
ব্যাটারা পালাতে না পারে!
যাক্, ওই একটা ট্যাক্সি!
ট্যাকসি! সেনট্রাল স্টেশনে যাব!
সামনের ওই গাড়িটার পিছু নিতে হবে!
MB-1420
?
?
ট্যাকসি তো আমি নিয়েছি, আপনি উঠলেন কেন?
বা রে, ট্যাকসি তো আমি নিলুম!
দেখুন মশাই, ঝামেলা করবেন না। পনর মিনিটের মধ্যে সেনট্রাল স্টেশনে আমাকে পৌঁছতে হবেই।
আর আমাকে পৌঁছতে হবে হাসপাতালে...এক্ষুনি!
এই পাগলা-কুকুরটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে কিনা!
ড্রাইভার, জোরে চালাও! ওই গাড়িটাকে ধরতে হবে!
কোন্ গাড়িটা সার?
যাচ্চলে, গাড়িটা সরে পড়েছে! ঠিক এই ভয়ই করছিলুম!
এখন যে-গলির মধ্যে কারাবুজানের সেই মেট্‌কে দেখেছিলুম, সেইখানেই আবার যেতে হবে।
কিন্তু তার আগে পোশাক পালটানো দরকার, নইলে ওরা চিনে ফেলবে।
পুরনো জামাকাপড়ের দোকান! কিন্তু...কিন্তু...নাঃ, ওরাই বটে।

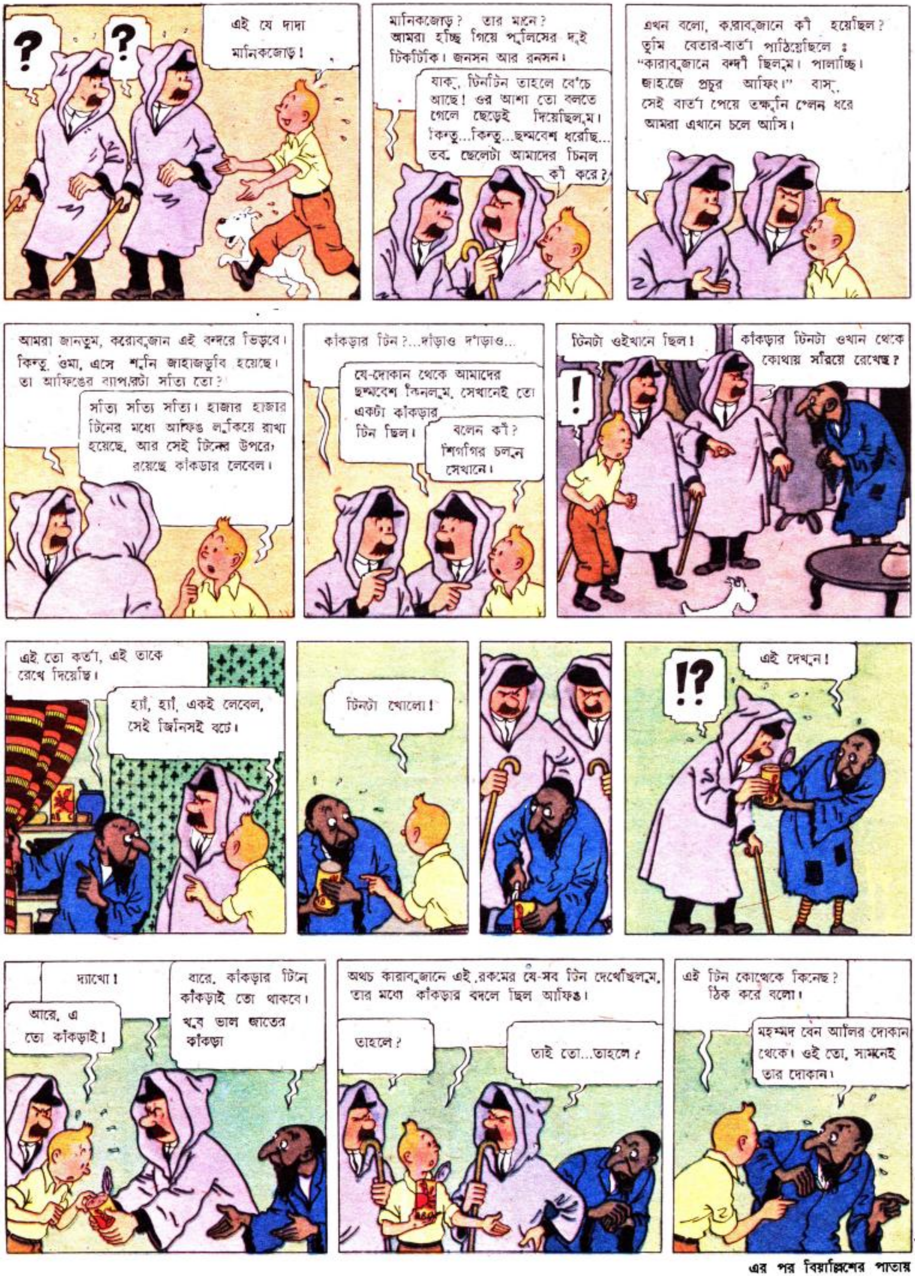

এর পর বিয়াল্লিশের পাতায়

আজব চিড়িয়াখানা

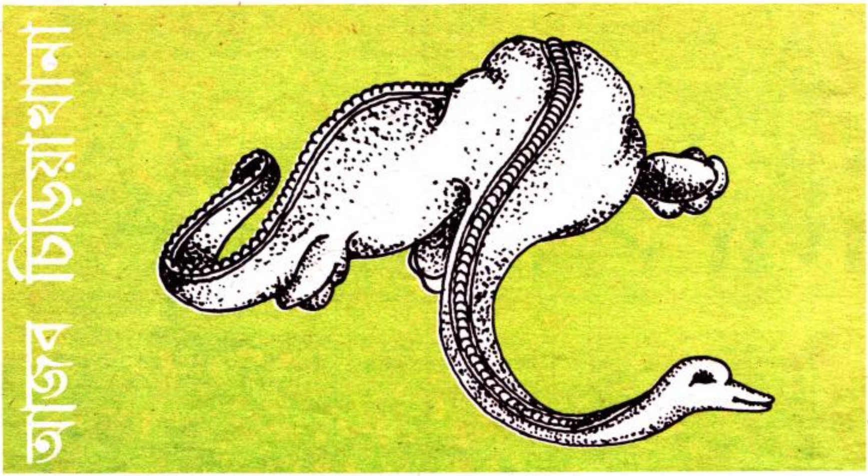

নাম তার—নেসি। নিবাস—লক্‌স নেস। লক্‌স নেস স্কটল্যান্ডের একটি হ্রদ। লম্বায় চব্বিশ মাইল, চওড়ায়—এক থেকে দু মাইল। গভীরতা—সাতশো ফুট। কোথাও কিছু বেশী, কোথাও কম। এই হ্রদেই বাস করে নেসি। শত শত বছর ধরে লক্‌স নেস-ই তার ঠিকানা। এখনও।

প্রথম তার কথা শোনা গিয়েছিল অনেক শো বছর আগে। একজন খৃষ্টান পাদ্রী ওদিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন—হ্রদের ধারে একজন মানুষকে কবর দেওয়া হচ্ছে।—কী হয়েছিল ওর? জানতে চাইলেন ভালমানুষ পাদ্রী। ওরা বলল—হ্রদের দাত্য মেরে ফেলেছে একে। পাদ্রী দেখলেন—জলে সত্যিই দৈত্যের মতো কী যেন ভেসে উঠল। তিনি ঈশ্বরের নাম নিলেন। বুকে ক্রুশ আঁকলেন। দৈত্যটি পালিয়ে গেল।

তারপর বহুকাল চুপচাপ থেকে একেবারে একালে। আবার ভেসে উঠল সেই দৈত্য। জলদানো। ১৯৩৩ সনের কথা। হ্রদের ধার ঘেঁষে রাস্তা তৈরী হচ্ছিল তখন। শ্রমিকেরা প্রায়ই বলে তারা দেখতে পায় জলের তলায় কে যেন সাঁতার কাটছে। জল তোলপাড়। পেছনে 'ভি' আকারে ফেনার পুঞ্জ। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দুটো কুঁজ। বোধহয় জলদানবের পিঠ। গাড়ি চালিয়ে নতুন রাস্তা ধরে যেতে যেতে একদিন মিস্টার আর মিসেস ম্যাকে দেখলেন, জলের দাত্যি ডাঙার শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনও প্রাণী। বিশাল চেহারা তার। মানুষের সাড়া পেয়েই পালিয়ে গেল জলে। কেউ ধরতে পারছেনা নেসিকে। ১৯৩৪ সনের জুলাইয়ে কুড়িজনের একটি দল গড়া হয়েছিল হ্রদের ওপর নজর রাখার জন্য। সকাল নটা থেকে বিকেল দুটো পর্যন্ত তাঁরা ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে থাকতেন হ্রদের ধারে, এখানে ওখানে। দৈত্যটা যদি কখনও ভেসে ওঠে সেই আশায়। খান কয় ছবিও তাঁরা তুলেছিলেন। কিন্তু ধোপে টি'কল না। বিজ্ঞানীরা নেড়ে চেড়ে বললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

বিশ্বাসীরা তবু অটল। তাঁরা মাঝেমাঝেই নাকি লক্‌স নেস-এর সেই জলজন্তুটিকে দেখতে পান। ১৯৬০ সন থেকে টিম ডিনসডেল নামে এক সাহেব তো সব কাজকর্ম ছেড়ে ওই দৈত্য নিয়েই আছেন। টি-ভিতেও একবার ছবি দেখালেন নেসির। ছবি অস্পষ্ট। কিন্তু তাই নিয়ে চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা আর আলোড়ন। '৬৪ সনে জলের ওপর মঞ্চ গড়ে ক্যামেরা খাটানো হল। নেসির স্পষ্ট ছবি চাই। সেবারও ছবি উঠল ভাসাভাসা। ছবি দেখে সঠিক কিছুই বলা যায় না। সাবমেরিন, দূরবীন, আধুনিক নানা সাজসরঞ্জাম—সব কিছুই কাজে লাগানো হচ্ছে। নেসি তবু ধরা পড়ছে না। তাকে নিয়ে তর্ক চলছেতো চলছেই। একদল বলেন, দূর, এসব বাজে কথা. জলে আসলে দৈত্য নেই। অন্য দল বলেন. আলবাত আছে!

আজব চিড়িয়াখানার আজব প্রাণীরা বুঝি বা এভাবেই জন্মায়। জন্মাচ্ছে এখনও। আমাদের কাছাকাছি আর-এক নমুনা তার—ইয়েতি। তার বাস—হিমালয়ে। শেরপারা নাকি অনেকেই দেখেছে তাকে। সাত থেকে সাড়ে সাত ফুট উঁচু। সারা গায়ে লম্বা বাদামী চুল। ডিমের আকারের মাথা, ওপরের দিকটা সরু। গোরিলার মতো মুখ। সাধারণত মানুষের মতো চলে দু'পায়ে ভর দিয়ে। ইত্যাদি। এভারেস্টে চড়তে গিয়ে অভিযাত্রীরা বরফে তার পায়ের ছাপ দেখেছেন। এরিক শিপটন ছবিও তুলে এনেছিলেন সেই ছাপের। কিন্তু কত চেষ্টাই না করা হলো, ইয়েতি তবু ধরা পড়ল কই! হিলারি মিছিমিছি হয়রান হলেন—ইয়েতি খুঁজতে গিয়ে। তাই বলে কি বলা যায়, নেসি মিথ্যা,—মিথ্যা ইয়েতি? না। কারণ, বনের বাঘের মতোই সত্য মনের বাঘ। কল্পনাতেও অবশ্যই মজা আছে একটা।

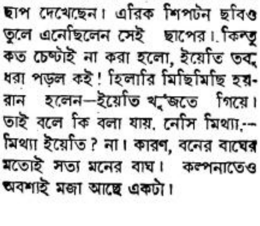

কেন?

দশের হিসেবে গুনি কেন?

এক থেকে দশ, তারপর এগারো থেকে কুড়ি, একুশ থেকে ত্রিশ...; এক দশ এক এগারো, এক দশ দুই বারো... দুই দশ পাঁচ পঁচিশ...পাঁচ দশ সাত সাতান্ন...এইভাবে, আমাদের যাবতীয় সংখ্যা গণনায় একটা দশের হিসেব আছে। যদি ভাবা যায়, কেন এমন হলো, হঠাৎ একটু ধন্ধ লাগে বই কী। কারণটা কিন্তু খুবই সাদামাঠা ও স্বাভাবিক। আমাদের দুই হাত মিলে আঙুলের মোট সংখ্যা যে দশ, এই সরল সত্যটাই গণনার ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতির মূলে।

নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা যখন প্রথম গুণতে শিখলে, আঙুল গুণে-গুণেই সংখ্যার ধারণায় পৌঁছেছিলে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মানুষ যেদিন প্রথম সংখ্যা বিষয়ে ধারণা করে, আঙুল গুণেই সে ধীরে-ধীরে তা বুঝতে চেষ্টা করেছিল। এজন্যই, প্রথম থেকেই তাবৎ সংখ্যা তার কাছে দশে-দশে ভাগ হয়ে যায়; পনেরোকে বলে এক দশ আর পাঁচ, বাইশকে দুই দশ আর দুই...এভাবেই সে সংখ্যাকে বোঝে। শূন্যও যে একটা সংখ্যা, এটা বুঝতে মানুষের কিন্তু ঢের দেরি হয়।

এক থেকে দশ গুণতে, একবার সবকটি আঙুল মানুষ ব্যবহার করে এবং দশের চেয়ে বেশী সংখ্যা গুণতে সে আবার প্রথম আঙুল থেকে শুরু করে। মানুষের হাতের দশ আঙুল দশের হিসেবে সংখ্যা গোনার নিয়ম চালু করেছে, এবং পৃথিবীর সর্বত্র ও সবসময়েই এই পদ্ধতি প্রচলিত।

জানো কি, ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা এবং আঙুল—দুয়েরই ইংরেজি হলো ডিজিট্?

তেলে জলে মিশ খায় না কেন?

"তেলে জলে 'মিশ খায়' শুনেছ তা কেউ কি?"—নিশ্চয়ই শোনো নি। কিন্তু কেন ওরা মিশ খায় না?

আসলে, দুই তরলের—যেমন জলে দুধে—মিশ্রণ তখনই ঘটে, যখন ঐ দুই ভিন্ন তরলের অণুগুলি গঠনগতভাবে প্রায় একইরকম। একেবারে সদৃশ হলে সবচেয়ে ভালো মেশে; জলের সঙ্গে জলের মতো কে মেশে আর!

তেল ও জলের অণুগুলি খুব বেশী ভিন্ন রকমের। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু, মাত্র এই তিনটি পরমাণু নিয়ে গঠিত জলের একটি অণু খুব ছোট। তেলের অণু কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিরাট, অনেক পরমাণু নিয়ে তৈরী। তেলের বড় বড় অণুগুলি, খুব সহজে ও স্বাভাবিকভাবে, পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়, অন্য ধরনের ছোট ছোট জলের অণুর সঙ্গে 'মিশ খায়' না। তেমনি, জলের অণুগুলি, বড় বড় তেলের অণুর সঙ্গে সংযোজিত না হয়ে, নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়। তেলে জলে মিশ না খাওয়ার কারণটা, সহজ কথায় এই।

মজার অঙ্ক অঙ্কের মজা

কোনো সংখ্যাকে ১০ দিয়ে গুণ করা মানে যে ডান দিকে কেবল একটা শূন্য বসিয়ে উত্তর করে দেওয়া, সে তো তোমরা জানোই। কিন্তু ১১ দিয়ে গুণ করারও যে একটা সহজ পদ্ধতি রয়েছে তা কি জানো?

যারা জানো না, তাদের জন্যই একটা মজার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। এই নিয়মে খুব চটপট উত্তর করে ফেলা যায়।

ধরো, কোনো সংখ্যাকে ১১ দিয়ে গুণ করতে হবে। কিন্তু আমরা গুণের মধ্যেই যাবো না। কেবল গুণ্য সংখ্যাটির একটা সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যা যোগ করে উত্তর বসাবো। দুটো জিনিস কেবল মনে রাখার।

প্রথমত, একদম ডান দিকের সংখ্যাটি প্রথমেই যেমন-আছে বসবে। তারপরের সংখ্যাগুলিকে দু-বার করে ধরে যোগ (একবার ডানদিকে অন্যবার বাঁদিকে) করতে হবে।

ধরো, ৭১ কে ১১ দিয়ে গুণ করতে হবে। একদম ডান দিকে রয়েছে ১। সুতরাং ১ বসবে অবিকলভাবে। এর পর যোগ করব ১+৭=৮। এটা বসাবো ১ এর আগে। এর পর ৭ কে আরেকবার ধরব। হাতে যেহেতু কিছু নেই, সুতরাং ৭ সংখ্যাটা একদম বাঁ দিকে বসিয়ে উত্তর সম্পূর্ণ করব। এইভাবে ৭১×১১=৭৮১।

আরেকটা উদাহরণ দেখো। ৯৮৪৫×১১=১০৮২৯৫। উত্তরে লক্ষ করো, ৫ বসছে অবিকৃতভাবে। তার আগে বসল ৫+৪=৯। এর পর ৪+৮=১২র ২, হাতে রইল ১। ৯+৮=১৭, কিন্তু হাতের ১ যোগ করে হল ১৮। সুতরাং ৮ বসানো হল। হাতে ফের ১ রইল। ৯+১=১০ বসল পুরোপুরি।

এইভাবে গুণনীয় সংখ্যাটির সংখ্যাগুলো যোগ করে-করে খুব চটপট বার করে ফেলা যায় ১১ দিয়ে গুণের উত্তর। কী মজার অথচ কী সহজ ব্যাপার, তাই না?

শুভঙ্কর

ঊনচল্লিশের পাতার পর

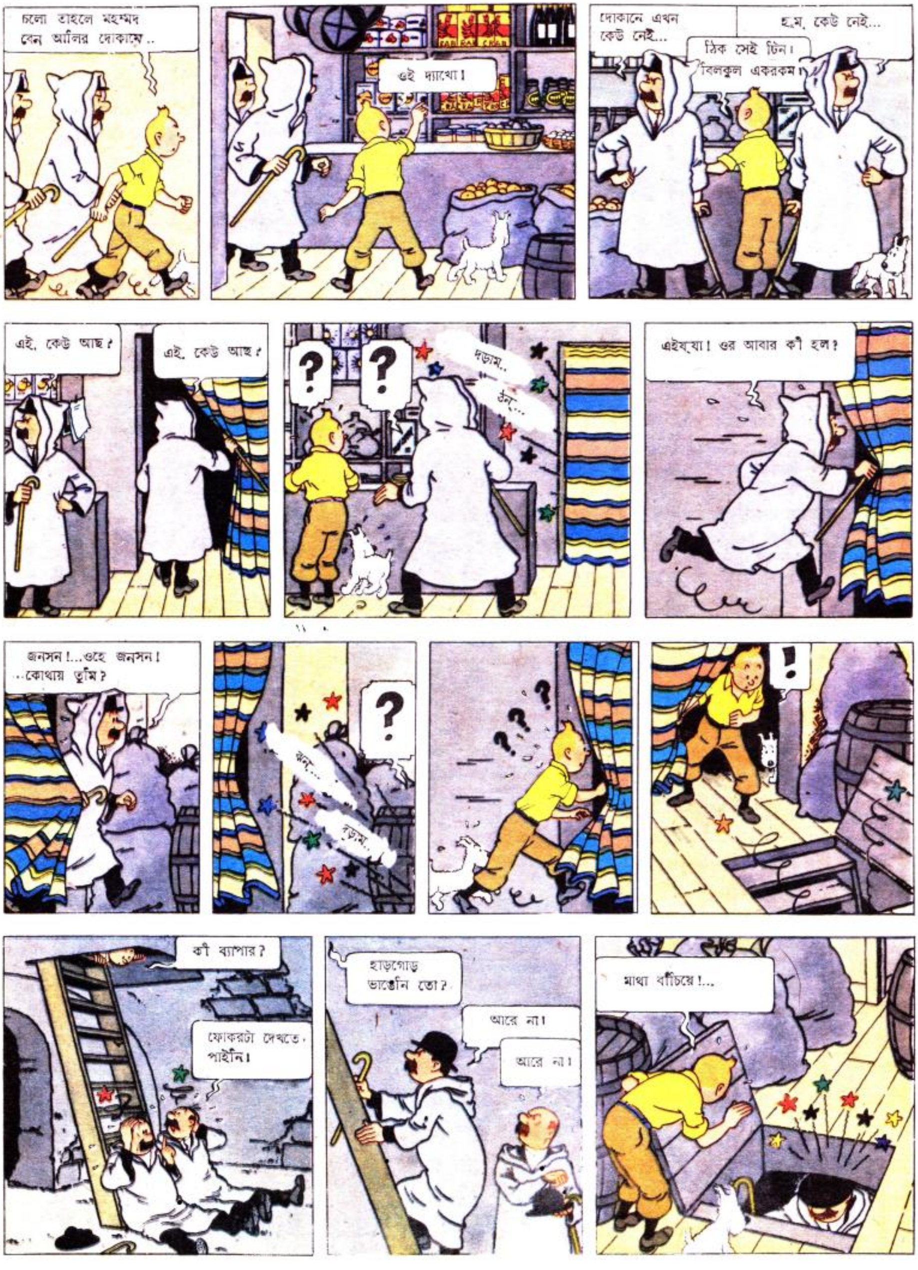

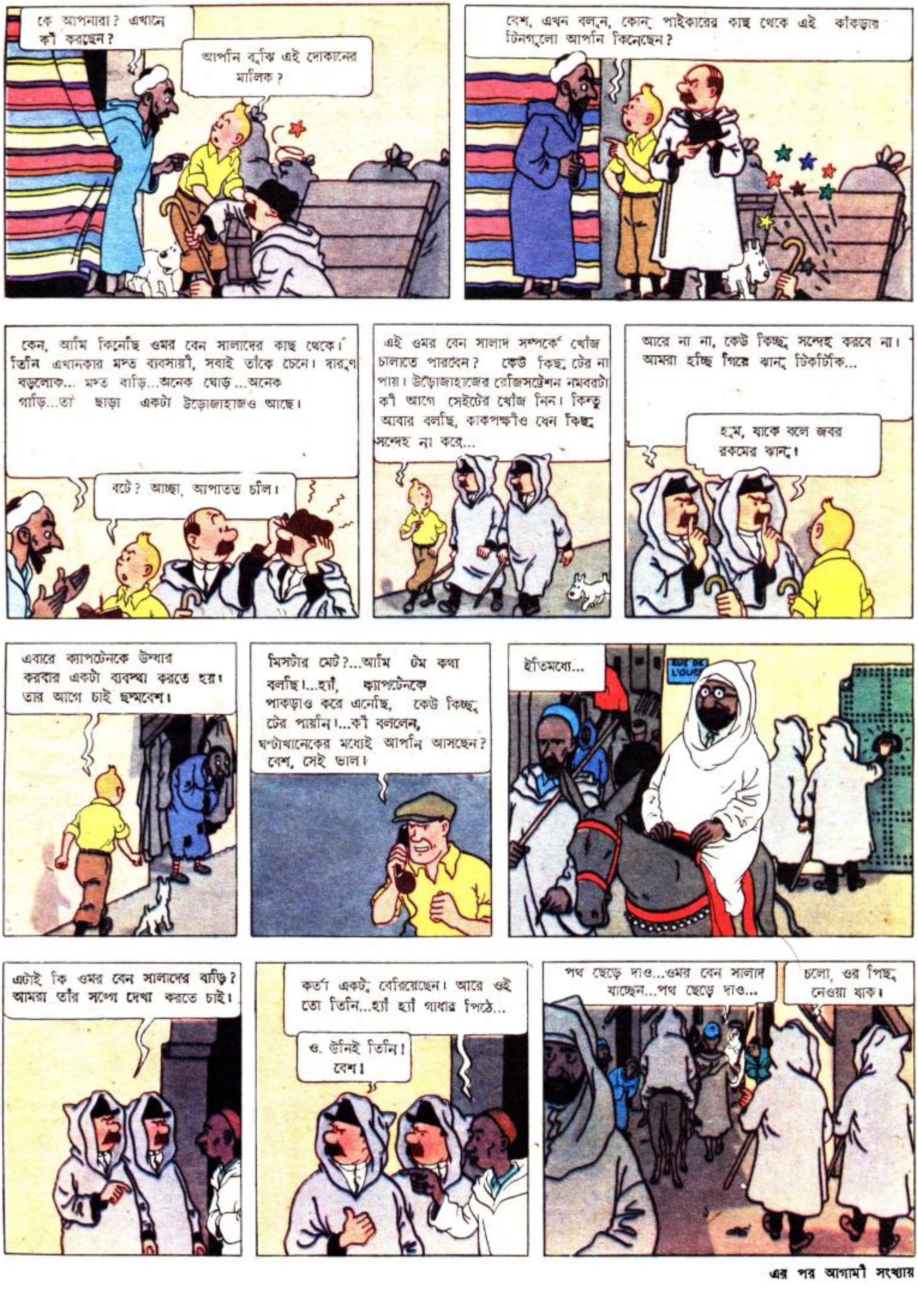

এর পর আগামী সংখ্যায়

শানুর কথা

শেখর বসু

শানু এইটুকুন ছেলে। ভীষণ দুষ্টু। টলমল-টলমল করে দৌড়োয়, ধুপ-ধুপ করে পড়ে, খিলখিল করে হাসে। শানু জলকে বলে "গ", কলাকে বলে "কপকা", জুতোকে বলে "দুগো", তবে দিদিকে বলে "দিদ্‌দি"।

দিদির নাম সোনিয়া। ঠিক পাঁচবছর বয়েস। নিজে সব কথা ঠিক-ঠাক বলতে পারে তো, তাই ভাইয়ের কথা শুনে খুব হাসে। মাও হাসে, বাবাও হাসে। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই সোনিয়া ছুটে গিয়ে বলে, "জানো, ভাই না জলকে বলে গ, মাছকে বলে মাম।" শুনে সবাই অবাক হয়ে বলে, "ওমা, তাই নাকি! ডাকো তো শানুকে। শানু, এই শানু।"

শানুর কথা শুনে-শুনে বাড়ির সবাই এখন শানুর মতো কথা বলে। জল খাবার দরকার হলেই বাবা বলে, "কই, এক গ্লাস গ দাও তো।" মা অমনি এক গ্লাস জল এনে দেয়। বাবা জুতো পরে শোবার ঘরে ঢুকলে মা বলে, "এ মা, সাতরাজ্যের ধুলো শোবার ঘরে ঢোকালে তো, যাও দুগো বাইরে খুলে এসো।" বাবা তখন বাইরে জুতো খুলে রেখে আসে।

বাজারে যাবার সময় রাধু জিজ্ঞেস করে, "আজকে কী মাম কিনব—রুই না চিংড়ি? কী কপকা আনব—সিঙ্গাপুরী না মর্তমান?" মা তখন বলে দেয় কী মাছ কিনতে হবে, কী কলা আনতে হবে। বাড়ির কেউ আর এখন মাছকে মাছ বলে না, কলাকে কলা বলে না, জুতোকে জুতো বলে না, শানু যা বলে সবাই তাই বলে।

শানুর নতুন-নতুন কথা দিন-দিন আরও বেড়ে যায়। শানু এখন গ্লাসকে বলে "গস", বেলুনকে "এলু", খবরের কাগজকে "তাকু"। রোজরোজ এত নতুন-নতুন কথা বললে কি সবাই আর মনে রাখতে পারে?

শানু কী বলছে বাবা অনেক সময় বুঝতেই পারে না। ঠাকুমা হাসতে-হাসতে বলে, "তুই কি আর কথা বলতে শিখবি না?" মা দুবার "কী ? কী?" করে তবে বুঝতে পারে। শানুর কথা একবারেই শুধু বুঝতে পারে শানুর দিদ্‌দি সোনিয়া। সোনিয়া সবসময় ওর সঙ্গে থাকে তো, সেই জন্যে। বাবা, মা, ঠাকুমা শানুর কথা বুঝতে না পারলে সোনিয়া বুঝিয়ে দেয়।

বাবা বলে, "সোনিয়া, তুমি এক কাজ করো। তুমি তো এখন লিখতে শিখেছ, তুমি একটা খাতায় শানুর কথাগুলো লিখে রাখো। আমরা যখন শানুর কথা বুঝতে পারব না তখন খাতাটা দেখে নেব। তবে খাতাটা ওই উঁচু টেবিলটার ওপরে রাখবে, নীচে রাখলে শানু ছিঁড়ে দেবে।"

কথাটা সোনিয়ার খুব পছন্দ হল। ও ছুটে গিয়ে লিখতে বসে গেল ওর লাল খাতা আর নীল পেনসিল নিয়ে। ওর মুখের ওপরে একমাথা চুল বারবার উড়ে এসে পড়ছিল, ও তখন এক হাতে চুল চেপে রেখে লিখতে লাগল। এমন সময় শানু কোত্থেকে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ঝুলতে শুরু করে দিল।

অন্যসময় হলে সোনিয়া ওকে আদর করত, ওর সঙ্গে খেলা করত, কিন্তু এখন ও লিখছে তো, তাই চেঁচিয়ে মাকে ডেকে বলল, "মা, শিগ্‌গির ভাইকে এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি এখন লিখছি।" মা এসে শানুকে নিয়ে গেল।

সোনিয়া অনেকক্ষণ ধরে লিখল, তারপরে বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, এই দেখ লিখেছি।" সোনিয়া লিখেছে :

শানু জলকে বলে গ
শানু বেলুনকে বলে এলু
শানু খবরের কাগজকে বলে তাকু

শানু যা-যা বলে সোনিয়া সব লিখেছে। সবার শেষে বড়-বড় করে লিখেছে, ইতি সোনিয়া।

সব দেখে বাবা বলল, "বাহ্‌, খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আমরা শানুর কথা বুঝতে না পারলেই খাতাটা দেখে নেব।" বাবা নীল পেনসিলটা নিয়ে লাল খাতাটার ওপরে বড়-বড় করে লিখে দিল, "শানুর কথা"। সোনিয়া খাতাটা মাকে দেখিয়ে, ঠাকুমাকে দেখিয়ে উঁচু টেবিলটার ওপরে রেখে দিল।

একদিন সকালবেলায় মা বলল, "সোনিয়া তুমি শিগ্‌গির মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।"

ও জিজ্ঞেস করল, "কেন, মা?"

মা বলল, "সে কী, তোমার মনে নেই? আজকে তোমার তো স্কুলে ভর্তি হবার কথা।"

সত্যিই তো! সোনিয়ার একদম মনে ছিল না। স্কুলে ভর্তি হবার কথা শুনে ওর খুব আনন্দ হল। মিনু, টাবলু, রুমকিদি সবাই স্কুলে পড়ে। স্কুলের জামা পরে

ওরা রোজ সকালে স্কুলে যায়। ওদের দেখে-দেখে সোনিয়ারও স্কুলে যাবার ইচ্ছে হয় ভীষণ। কদ্দিন বাবাকে বলেছে, কদ্দিন মাকে বলেছে, "আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। আমিও ওদের মতো স্কুলে যাব। শুনে বাবা বলেছে, "তুমি এখন একটু ছোট আছো তো, আর একটু বড় হলেই স্কুলে ভর্তি করে দেব।" মা বলেছে, "এই তো, সামনের জানুয়ারি থেকেই স্কুলে যাবে।" জানুয়ারি কবে আসবে? মা তখন ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কোন্ মাসের পরে কোন্ মাস আসে।

রাঙাপিসি যে ফ্রকটা দিয়েছিল, মা সেই ফ্রকটা সোনিয়াকে পরিয়ে দিল, তারপরে আদর করে বলল, "তুমি স্কুলে গিয়ে একটুও দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী

হয়ে থাকবে। তোমাকে দিদিরা যা জিজ্ঞেস করবেন, সব কথার উত্তর দেবে. কেমন?"

সোনিয়া বলল, "আচ্ছা।"

মা বলল, "যাও এবার ঠাকুমাকে প্রণাম করে এসো।"

সোনিয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করল।

ঠাকুমা বলল, "দুগ্‌গো, দুগ্‌গা, এবার মাকে নমো করো।"

মা বলল, "এবার বাবাকে।"

বাবা বলল, "এবার শানুকে আদর করো।"

শানু বারান্দার রেলিংয়ের মধ্যে দুই হাত দুই পা ঢুকিয়ে দিয়ে পাশের বাড়ির টিয়া পাখিটার সঙ্গে গল্প করছিল। সোনিয়া ভাইকে আদর করে বাবার হাত ধরে দাঁড়াল।

দিদি আর বাবাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেই শানু টলমল করে ছুটে এসে হাত নেড়ে বলল, "তা-তা।"

কেউ বাড়ি থেকে বেরুলেই শানু টা-টা করে।

বাবা বলল, "শানু, তোমার জন্যে কী আনব?"

শানু বলল "এলু"। এলু মানে বেলুন।

"আর?"

শানু বলল, "আত্।"

সোনিয়া বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বল তো, আত মানে কী?"

"কী?"

"আত্ মানে সন্দেশ, ভাই কাল থেকে বলছে।"

"তুমি খাতায় লিখে রেখেছ?"

"না তো, এসে লিখব।"

রাস্তায় নেমে সোনিয়া আর ওর বাবা মিনিবাসে উঠল। বাসে উঠেই সোনিয়া গল্প শুরু করে দিল। কতো গল্প, গল্প আর ফুরোয় না। টাবলুদের স্কুলটা কী সুন্দর। মিনু আর রুমাকিদিদের স্কুলটাও খুব ভালো। আমাদের স্কুলটা কেমন? আমাদের স্কুলে খেলার মাঠ আছে? রাস্তার দুধারে লম্বা-লম্বা গাছ আছে? আমাদের স্কুলে বন্ধু কজন?

বাসে এত গল্প তো, কিন্তু সোনিয়া যেই না স্কুলে ঢুকল, অমনি ওর সব কথা থেমে গেল। খালি বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বাবা বলল, "দেখ, দেখ, তোমাদের স্কুলটা কী সুন্দর! কতো বড় লাল বাড়ি। এই দেখ কী

সুন্দর খেলার মাঠ, দোলনা। ওই দেখ কতো গাছ। দেখ, ভালো করে দেখ। স্কুলে এলে চুপ করে থাকতে নেই, ভয় পেতে নেই। এখানে সবাই ভালো। সবাই তোমাকে ভালবাসবে।"

বাবা সোনিয়াকে নিয়ে হেড্‌মিস্‌ট্রেসের ঘরে ঢুকল।

হেডমিসট্রেস বাবাকে বললেন, "আসুন, আসুন। সোনিয়াকে বললেন, "এসো, এসো।"

ঘরটার তিনদিকে আলমারি, আলমারিতে কতো বই। দেয়ালে রঙিন ম্যাপ, টেবিলের ওপরে চীনেমাটির গ্লাসে কতো পেনসিল—লাল, নীল, সবুজ, হলুদ। সোনিয়া পেনসিলগুলো দেখছিল। বড়মাসীর মতো দেখতে হেড্‌মিস্‌ট্রেস কী ভালো, সোনিয়াকে আদর করে বললেন, "তুমি পেনসিল নেবে, এই নাও।"

সোনিয়া প্রথমে নিতে চায়নি, বাবা বললে তবে নিল।

হেড্‌মিসট্রেস বললেন, "এবার তোমার নাম বল।"

সোনিয়া নাম বলল।

উনি তখন বললেন, "কী লক্ষ্মী মেয়ে।"

আস্তে আস্তে সোনিয়ার সঙ্গে ও'র খুব ভাব হয়ে গেল। উনি কতো কথা জিজ্ঞেস করলেন, সোনিয়া সব কথার উত্তর দিল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা সোনিয়াকে বলে দিয়েছিল তো দিদিরা যা জিজ্ঞেস করবে সব কথার উত্তর দেবে, সোনিয়া তাই একবারও চুপ করে থাকেনি।

হেডমিসট্রেস সোনিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলতো ওয়াটার মানে কী?"

সোনিয়া আস্তে-আস্তে বলল, "গ"।

উনি বুঝতে পারলেন না। একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, এবার বল তো ফিশ মানে কী?"

সোনিয়া এবার জোরে-জোরে উত্তর দিল,

"ফিশ মানে মাম্।"

বলতেই বাবা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে হেড্‌মিস্‌ট্রেসকে বলল, "ওর ছোটভাই এখনও কথা বলতে শেখেনি, জলকে 'গ',মাছকে 'মাম' বলে, তাই শুনে শুনে সোনিয়াও ভুল করে ফেলেছে।"

তারপরে সোনিয়াকে বলল, "শানু তো ছোট, তাই ছোটদের মতো কথা বলে, তুমি এখন বড় হয়েছ, বড়দের মতো কথা বলো।"

শুনে সোনিয়ার খুব রাগ হয়ে গেল। ও বলল, "আমি তো বড়দের মতোই কথা বলছি। বড়রাও তো জলকে 'গ' বলে। তুমি মাকে বলো না, কই, এক গ্লাস গ দাও? মা অমনি তোমাকে জল এনে দেয়।"

সোনিয়ার কথা শুনে বড়মাসীর মতো দেখতে হেড্‌-মিস্‌ট্রেস ফিক করে হেসে ফেললেন। আর বাবা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বাবা হেসে হেসে বলল, "সত্যিই তো। তুমি ঠিক বলেছ। আর আমি ছোটদের মতো কথা বলব না, তুমিও বলবে না, কেমন?"

হেড্‌মিস্‌ট্রেস বললেন, "সোনিয়া, তুমি তো এখন স্কুলে ভর্তি হলে, ভাইকে এবার বড়দের কথা শিখিয়ে দেবে, আর বড়দের বলবে বড়দের মতো কথা বলতে, পারবে তো?"

সোনিয়া বলল, "পারব।"

স্কুলে ঢোকার সময় সোনিয়ার কী ভয় করছিল, কিন্তু বাড়ি ফেরার মুখে ওর খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আমার স্কুলের বন্ধুরা কোথায়?"

বাবা বলল, "যখন তুমি বইখাতা নিয়ে রোজ স্কুলে যাবে, তখন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।"

বাড়ি ফিরে সোনিয়ার আর স্কুলের গল্প শেষ হতে চায় না। ইস্, স্কুলটা কী সুন্দর, বড়মাসীর মতো হেড-মিসট্রেস কী ভালো, ওকে কতো বড় একটা লাল পেনসিল দিয়েছে। সোনিয়া সবার সঙ্গে স্কুলের গল্প করল—মার সঙ্গে, ঠাকুমার সঙ্গে, মিনু, টাবলু আর রুমকি-দিদের সঙ্গে।

শেষকালে ও শানুর সঙ্গেও স্কুলের গল্প শুরু করে দিল। শানু কিছু বোঝে না, কিন্তু বড়-বড় চোখ করে সব শুনল, তারপরে "ইগলু, তমানি, মুমু-উ-উ-উ" বলে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। খুব আনন্দ হলে শানু এইরকম অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা বলে, হাততালি দেয় আর নাচে।

পরদিন সকালবেলায় রাধু বাজার যাবার সময় মাকে জিজ্ঞেস করল, "আজকে কী মাম কিনব—ইলিশ না

ভের্টাক? কী কপকা আনব—মর্তমান না কাঁঠালী?"

মা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সোনিয়া বলল. "রাধুদা তুমি তো বড়, ছোটদের মতো কথা বলছ কেন? এবার থেকে মাছকে মাছ বলবে, কলাকে বলবে কলা। আমাদের স্কুলে বলে দিয়েছে, বড়রা বড়দের মতো কথা বলবে। শানু তো এখন একটু-একটু করে বড় হচ্ছে. আমি এবার ওকে বড়দের কথা শিখিয়ে দেব।"

"রাধুদা বলল, "বেশ।"

রোজ সকালে ঘুম ভাঙলে বাবা শুয়ে-শুয়ে চা খায়। আজকেও খাচ্ছিল। চা খেতে-খেতে মাকে বলল, "তাকু আসেনি এখনো?"

সোনিয়া জানলার ধারে বসে পুতুলকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, তুমি আর কক্ষনো ভাইয়ের মতো খবরের কাগজকে তাকু বলবে না। বলবে, খবরের কাগজ। তুমি কি ছোট? তুমি কি শানু?"

বাবা বলল, "তাই তো, আমার একদম মনে ছিল না। এবার থেকে আমি আর শানুর মতো কথা বলব না। দেখ তো খবরের কাগজ এসেছে কি না?" সোনিয়া ছুটে গিয়ে বাবাকে কাগজ এনে দিল।

মা সেদিন খেতে বসে সোনিয়াকে বলল, "যাও তো ও-ঘর থেকে গ-এর জাগটা নিয়ে এসো।"

সোনিয়া রাগ করে বলল, "কী বললে? কিসের জাগ?"

মা তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিল, "এইরে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম, গ না, জলের জাগটা নিয়ে এসো তো।"

সোনিয়ার শাসনে বড়রা এখন আর শানুর মতো কথা বলতে পারে না। বড়রা শুধু বড়দের মতো কথা বলে।

শানুও একটু-একটু বড় হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই বড়দের মতো কথা শিখতে চায় না। সোনিয়া রোজ স্কুল থেকে ফিরে ওকে বড়দের কথা শেখাতে বসে। বলে, "বল তো জল।" শানু বলে "গ"। বলে, "বল তো মাছ।" শানু বলে "মাম"।

সোনিয়া ওকে কতো বোঝায়, আদর করে, কিন্তু শানু একবারও জলকে জল, মাছকে মাছ বলে না। কেউ কথা না শুনলে সোনিয়ার খুব রাগ হয়ে যায়। ও রাগ করে ঠাকুরমার কাছে ভাইয়ের নামে নালিশ করে। ঠাকুমা সোনিয়াকে আদর করে বলে, "তুমি ওকে রোজ শেখাও, দেখবে ও ঠিক শিখে যাবে।"

একদিন সত্যি-সত্যি শানু "কপকা" না-বলে কলা বলল। সেদিন সোনিয়ার সে কী আনন্দ। বাবা, মা, ঠাকুমা, বন্ধুদের সবাইকে দশবার করে বলল, "জানো, ভাই না বড়দের মতো কলাকে কলা বলেছে।"

আস্তে-আস্তে শানু জলকে জল, মাছকে মাছ, জুতোকে জুতো বলতে শিখে গেল। গ, মাম, দুগো এসব আর বলতো না, তবে অ-নে-ক-দি-ন শানু "লক্ষ্মণ"-কে লক্ষ্মণ বলতে পারতো না, বলতো "লট্ঠন।"

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

মনোবলে বলীয়ান

বাংলার স্কুল-ফুটবলাররা

আনন্দমেলার দফতরমুখো রাস্তাটা এখন হট্টমেলারই সামিল। সামনেই ফুটবল মরশুম, জার্সি বদল নিয়েই এত হইচই। ফুটবল-ফোড়েদের গুলতানিতে সারা দুপুরটাই রাস্তাটা ভনভন করে। এই জটলার আলোচনার ঢঙটা বড়ই একঘেঁয়ে। সামনে ফুটবল-মরশুমটা কেমন জমবে, সেটাই সকলের ভাবনা। আলোচনাটা ওরই মধ্যে একটু খিতোলে মোড় নেয় পিছন দিকে। আচমকা কেউ কেউ হিসেব কষে, আচ্ছা, গত মরশুমে বড় ছোট মিলিয়ে কটা ভারতজোড়া প্রতিযোগিতায় বাংলার ফুটবল-ছেলেরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে? অবাক কথা, সন্তোষ, বি সি রায় আর সুব্রত ট্রফির নাম করেই আলোচনা চুপসে যায়। হিসাবে সকলেই একটা মস্ত বড় ভুল করবেই। পাটনায় অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় স্কুল গেমসের শরৎকালীন প্রতিযোগিতায় যে বাংলার স্কুল ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এ হিসাবটা কেউ ধর্তব্য ভাবে না। শুধু এবারই নয়, এ-বার ধরে পরপর চার বছর বাংলার স্কুল ফুটবলাররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়ল।

এই কৃতিত্বটা নেহাতই খোলামকুচি নয়। স্কুল গেমসে চার বছর ধরে এমন দাপট কোনও রাজ্যের ফুটবলারই দেখাতে পারেনি। সেদিক থেকে বড়দের সন্তোষ ট্রফি পাওয়ার গৌরবের পাশে স্কুল-ফুটবলারদের কৃতিত্বটা বেশ জ্বলজ্বলে। ভবিষ্যতে সন্তোষ ট্রফি আনার দায়িত্বের ভার নেবার জন্য ওরা যেন এখনি কাঁধ বাড়িয়ে দিল।

উপর্যুপরি চার বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘটনায় বীরত্ব আছে। এই রেকর্ডটা গড়তে যারা সাহায্য করেছে তারা এখন ময়দানে বেশ ডাকসাইটে। একটা নাম আলাদা রাখছি। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বজিৎ দাস, সত্য মিত্র, শঙ্করী দাস, নাসিম, সন্তোষ মুখার্জী, শ্যামল মুখার্জী, শ্যামল ভট্টাচার্য, কৃপাল দাশগুপ্ত, প্রশান্ত ব্যানার্জী, সৌরভ দাস প্রমুখ। যার নাম আলাদা করে রেখেছি সেই বিশেষ নামী খেলোয়াড়টি প্রবীর দে। প্রবীর বেস্ট জুনিয়র ফুটবলার হওয়ার গৌরব অর্জন করেই অকালে চলে যাওয়ায় এই ঝলমলে রেকর্ডটার কথা সে জানতে পারল না।

বড়দের পাওয়া সন্তোষ ট্রফি নিয়ে বাংলার ছেলেরা গর্ব করে। অথচ স্কুল ফুটবলে বাংলার ছেলেদের রেকর্ডটা তেমন পাত্তা পায় না। গত পনের বছরে বাংলার স্কুল ফুটবলাররাই ফার্স্ট হয়েছে আট বার। তিনবার রানার্স আপ। তৃতীয় হয়েছে একবার।

প্রতিবার স্কুল গেমসে ফুটবল প্রতিযোগী ভিন্ রাজ্যের ছেলেরা এক রকম ওই নজিরটাকে স্মরণে রেখেই প্রতিযোগিতায় নামে। ধরেই নেয়, চেষ্টা করতে হবে বাংলার ছেলেরা যেন ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হতে না পারে। এই বাধাদানে সবাই এককাট্টা। আর, এই বরাবরের চ্যালেন্‌জ অনুযায়ী স্কুল গেমসে অন্য প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাংলার ছেলেমেয়েদের মনে একটি প্রতিজ্ঞা থাকে, ফুটবলে বাংলার মান কিছুতেই ছোট হতে দেব না। এ এক অদ্ভুত টাগ-অব-ওয়ার।

পাটনায় এবারও শুরুতেই ধারালো রেষারেষি হওয়ার কথা। গ্রুপ ম্যাচে কিন্তু কোন বিপক্ষ টিমই বাংলার ফুটবলারদের আক্রমণের তোপের মুখে তিষ্ঠোতে পারল না। রাজস্থান, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশকে নিয়ে তিনটি খেলায় বাংলার ছেলেরা চৌদ্দ বার বিপক্ষ গোলে বল ঢুকিয়েছে, নিজেরা খেয়েছে মাত্র দুটি গোল।

সত্যিকারের ঝমাঝম লড়াই হল সেমিফাইনালে। মণিপুরের ছেলেরা খুবই লড়াকু ফুটবলার। ফুল টাইমে তারা দুর্দান্ত বেগ দিয়েছে। শেষে টাই-ব্রেকার, ৫-৬ গোলে তারা হেরে ফিরে গেল। সেমিফাইনালের সেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কিন্তু ফাইনালের ধাপে দেখা গেল না। দিল্লির প্রতিদ্বন্দ্বী যেন হারতেই নেমেছিল। দু-গোল খেয়েই তারা নিভে গিয়েছে।

স্কুল গেমস ফুটবলে জেতার ইজ্জতটা বেশ আলাদা। চারটি বছরে চার রকমের হরেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বাংলার টিম ফাইনালে লড়েছে। প্রথম বছর আসাম, দ্বিতীয় বছর বিহার ও তৃতীয় বছরও সেই বিহার . টিমের বিরুদ্ধে বাংলার ছেলেরা ফাইনাল খেলে। সব টিমই বেশ মাসখানেক ধরে গুছিয়ে তালিম নিয়ে খেলতে যায়। অথচ বাংলার ছেলেরা গেমসে যাওয়ার আগে মাত্র তিনটি দিন হাতে পায়। আসলে ওই কটি দিনে বল নাড়াচাড়া তেমন আর হয়ে ওঠে না। একে অপরের মুখ চেনাচেনি করতেই কোথা দিয়ে তিন দিন কেটে যায়।

তাহলে বছর বছর বাংলার ছেলেরা সোনার মেডেল পায় কী ভাবে? খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই গোল্ড মেডেল পাওয়ার চাবিকাঠিটা থাকে একজন বিখ্যাত ফুটবলারের হাতে। বাংলার টিমের সেই অভিভাবকটি হলেন—প্রাক্তন ফুটবলার পরিতোষ চক্রবর্তী। ত্রিশের দশকের শেষ থেকে টানা চল্লিশের দশক জুড়ে এরিয়ান, মোহনবাগান, কালিঘাট ও ইস্টবেঙ্গল টিমের ব্যাক লাইনে উনি ছিলেন যেন স্তম্ভবিশেষ। শৈলেন মান্নার মত ফুল-ব্যাকও খোলা মনে বলেন, পরিতোষদা ওয়াজ এ গ্রেট ফুটবলার।

বাংলা টিমের ছেলেরা যেখানে-সেখানে ওর সঙ্গে দেখা হলেই ঢিপঢিপ করে প্রণাম করে। এত অল্প সময়ে কীভাবে বছর-বছর টিমকে চ্যাম্পিয়ন করছেন, সেটাই তাজ্জব ঘটনা। ও'র ধারণা, বাঙালী ছেলেরা চোখ ফুটলেই ফুটবল খেলা বুঝতে শুরু করে। উনি ছেলেদের বার বার বোঝান, ফুটবল পুরুষের খেলা, মারকুটে টিমের বিপক্ষে ভয় পেলে চলবে না। খেলা জিততে মনোবলই মূল কথা। ভাল খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কেউ পীড়াপীড়ি করলে উনি বলেন, বাড়িতে যা খাও সেই খাবার খেয়েই খেলতে হবে। মুখরোচক ভাল খাবার খেলেই ভাল ফুটবল খেলা যাবে, এটা ভুল ধারণা।

নিজের বাড়ি বাপ-মা ছেড়ে ভিন রাজ্যে ফুটবল খেলতে গিয়ে কম বয়সী প্রত্যেক প্লেয়ারেরই আপন জন ও আপন পরিবেশের জন্য মন টনটন করে। এজন্য পরিতোষবাবু গেমস চলাকালীন প্রতিদিনই নিজেদের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রার্থনাসভার ব্যবস্থা করেন। সেখানে প্রতিটি ছেলে তার প্রার্থনাসভায় নীরবে মা-বাবার মুখটি মনে করার চেষ্টা করে, শ্রদ্ধা জানায়।

পাটনায় স্কুল গেমসে এই ভাবেই মনোবলে বলীয়ান—সুভাষ রায়, গৌতম সোম, নরেন দত্ত, শরৎ দাস, মাইকেল ঘাগা, উইলিয়ামসন, এস ভট্টাচার্য, শান্তনু কর্মকার প্রমুখ ফুটবলাররা বাংলাকে চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন করেছে। এদের দাপটে একদিন ময়দান কাঁপবে।

বাপ কা বেটা

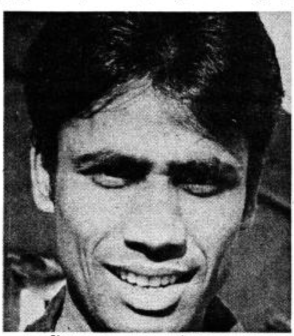

ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতেই তার বাপের নাম সম্পর্কে একটা মস্ত ভুল শুধরে নেয়া গেল। নামটা এতদিন ধ্যানচাঁদ সিং বলেই জানতাম। সেজ ছেলে রাজকুমার জানাল, "বাবার নাম আসলে ধ্যান সিং। চাঁদটা কে যে জুড়ে দিল, আমরা কেন, বাবাও তার হদিশ পান না। হবে হয়তো, দর্শকরা তাঁর খেলার চটকে আস্ত চাঁদটাকেই তাঁর নামের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন।"

সত্যিই শুধু ধ্যান কেন, ত'ার ছোট ভাই রূপও ছিলেন ভারতীয় হকি টিমে সোনার চাঁদ প্লেয়ার।

হকি-মাঠে বাপ-কাকার নাম রাখতে এখন ওদের ছেলে-ভাইপোরাও দস্তুরমত সচেতন। ধ্যানের ছেলে সাতটি, রূপের চার। বাংলা টিমের ক্যাপ্টেন রাজকুমার এগারোজনের টিম তৈরী করে বলল, "সিং-ব্রাদার্স জার্সি পরে মাঠে নামবে আর আমাদের বাবা-কাকা দুজনে খেলা পরিচালনা করবেন। এ-রকম গৌরব কোন্ হকি-পরিবারের আছে?"

সত্যিই হকি-ঐতিহ্য যেন ওদের মজ্জাগত। রাজের ঠিক পরের ভাই অশোককুমার গত চার বছর ধরেই ভারতীয় টিমের ফরোয়ার্ড লাইনে বড় চেনা মুখ। অশোকের পরেই উমেশ। তার পরেই দেভিন্দ্রকুমার', যার সম্বন্ধে রাজকুমার খুবই আশাবাদী।

মোহনবাগান টিমে উনত্রিশ বছর বয়সী রাজকে রাইট-হাফ পজিশনে দেখা গেল ছটি মরশুমে। এরই মধ্যে সে একবার ভারতীয় টিমের জার্সি পরেছে ফ্রান্সের সঙ্গে ঘরের মাঠে টেস্ট খেলায়। পাকা-পোক্তভাবে ভারতীয় টিমে জায়গা না-পাওয়া তার কাছে নেহাতই বরাতের খেলা। ধ্যান সিংও এ নিয়ে বলেন, হকি মাঠে রাজ কোনমতেই অশোকের চেয়ে কমজোরী নয়। বাবা-কাকার একচেটে ফরোয়ার্ড লাইন ছেড়ে কেন সে হাফ-লাইনের খেলোয়াড় হল? তুখোর রাজকীয় যুক্তি দিল রাজকুমার, "হাফে খেললেও সব সময়েই মাঠে দেখবেন আমি যেন ফরোয়ার্ডের সঙ্গে আক্রমণের খেলাই ভালবাসি।"

রীতিমত অবাক করল সে। "জানেন তো, বাবা-কাকা কেউই আমায় স্টিক ধরে খেলা শেখাননি।"

স্ট্রাইকার

ফ্রি-কিকের জাদুকর শৈলেন মান্না

হাওড়ার উত্তর-বাঁটরার সামন্তবাড়ির সেই হিলহিলে-চেহারা ছেলেটির বয়স সাড়ে একান্ন। আসলে ছেলেটির পদবী মান্না। সামন্তরা সম্পর্কে ও'র মামা। ঘরোয়া নাম খেঁদি। কই, নাকটার উপর দিয়ে তো রেল-গাড়ি চলে যায়নি। চেহারাটা কিন্তু সত্যিই বয়েসের আঁচে ঝলসে গেছে। শরীরের উচ্চতাটাই যা অটুট। এক ইঞ্চি কম ছ ফুট। সেই সামান্য চোপসানো ও লম্বাটে মুখের উপর আমূল ওল্টানো তেড়ি নিয়ে গোটা আদলের অনেকটাই বদল হয়েছে। চোখের দু-কোলই বেশ ভারী। মাথাটা এখন যেন খরায় ভরা মাঠ। তাহলেও মনটা বেশ মজবুত। ময়দানের ফুটবল-দর্শক নিয়ে তাঁর দুঃখঃ "হার-জিত নিয়ে আজকের দর্শক কেন এত নাচানাচি, মাথা-ফাটাফাটি করে বলতে পারেন? প্রিয় ক্লাব হারলে কেউ কেউ নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে।" কলকাতা ময়দানের দর্শককে উনি খুঁটিয়ে চেনেন সেই তিরিশের দশকের শেষ থেকেই। ভাল খেলে দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য ময়দানের কত বিকাল যে ও'র নামেই পরিচিত হয়ে আছে, থাকবেও, তার ইয়ত্তা নেই। উনিই গ্রেট ফুটবলার পদ্মশ্রী শৈলেন মান্না।

ময়দানের গত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে ফুটবল-দর্শকদের ছিলেন নমস্য। উনি নিজে কেমন মেজাজের দর্শক ছিলেন? ঝপ্ করে তবে ফিরে যেতে হয় ১৯৪০ আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে। যুযুধান দুই পক্ষ ছিল—মোহনবাগান ও এরিয়ান। বাঁটরার কজন বন্ধুকে নিয়ে উনি ক্যালকাটা মাঠে খেলা দেখতে লাইনে দাঁড়ান সকাল সাতটায়। লাইন-ভাঙাভাঙির হুজ্জুতে দস্তুরমত যুদ্ধ করে মাঠে ঢুকতে হয়।" চোখ ফুটে ইস্তক মান্না মোহনবাগানের সাপোর্টার। তাঁর কথাতেই সেই ম্যাচের বর্ণনা দিচ্ছি। "মোহনবাগানের জয় নিশ্চিত ভেবেই মাঠে ঢুকেছিলাম। ফলটা যে এত উল্টো হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। হারাধনদার (কে দত্ত) মত গোলকীপার যে চারটে গোল খাবে, কে ভেবেছিল? কিন্তু চোখের সামনে সেই আজব কাণ্ডই ঘটল। এরিয়ানের কাছে মোহনবাগান হারল ১—৪ গোলে। ভাবলাম, হারাধনদা যে চারটে গোল খেল, তা হতেই পারে। প্রতিটি গোলই ছিল নিখুঁত, যে কোন গোলকীপারকে হার মানাবে। মোহনবাগান সেদিন গো-হার হেরেছে, কিন্তু এক ফোঁটা উত্তেজিত হইনি। এমন কী, খেলার শেষে ক্লাব-তাঁবু ঘেরাও করার চিন্তাও মনে উঁকি দেয়নি। শুধু দুঃখে বোবা হয়ে গ্যালারিতেই বসে রইলাম। খেলা শেষ হয়ে সন্ধে নেমেছে। নিজেদের মধ্যে কোনও কথা নেই। মনের ভিতর একটা ভীষণ তোলপাড় ঘটল। ভাবলাম—এরিয়ানকে এই রেজাল্টটা ফেরত দেওয়া যায় না?"

রেজাল্ট ফেরত দেওয়া দূরে থাকুক দু মরশুম পরে সেই মোহনবাগান-সাপোর্টারটির উপর চোখ পড়ল এরিয়ানেরই কর্মকর্তাদের। লখনৌয়ে খেলতে গিয়ে এরিয়ানের গোলকীপার ওসমান খাঁ পিঠ চাপড়ে বলেন, 'ইয়ে লেড়কা জরুর আচ্ছা খেলেগা।" মান্না কথা দিলেন, উনি এরিয়ানে খেলবেন। ছাড়পত্র মরশুমের সময় ঠিকমত যোগাযোগের অভাবে মান্নার পক্ষে এরিয়ানের জার্সি পরা হল না। সেই মরশুমে মোহনবাগানে শরৎ দাসের পাশে

দুই খেলার দুই মহারথী,
মান্না ও মুস্তাক

একটি ছিপছিপে ছেলেকে ব্যাকে খেলতে দেখা গেল। তখন সেই নতুন ছেলে শৈলেন মান্নাকে নিয়ে কে আর বিরাট কিছু ভাবতে রাজি হবে?

শৈলেন মান্নার যেন রাজা-কপাল। দুটি মরশুমেই দর্শকরা টের পেতে শুরু করেছে, শরৎ দাসের পর শৈলেন মান্নাই হবে মোহনবাগান ব্যাক-লাইনে জবরদস্ত খুঁটি। মাত্র দুটি মরশুমেই এত বোলবোলাও। ১৯৪৪ সালের লীগ মরশুমের শেষ খেলাটি সবাই মান্নার-ম্যাচ হিসাবে মনে ধরে রেখেছেন। মহমেডান টিম এক পয়েণ্ট এগিয়ে থেকে মোহনবাগানের সংগে লীগের ফয়সালায় নেমেছে। কোনোক্রমে খেলা ড্র করলেই মহমেডান বাজিমাত করবে। জোর লড়াই চলল। একটা সন্ধিলগ্ন যে উপস্থিত, মাঠে হাজির কোন দর্শক-খেলোয়াড়ই তার হদিশ পেল না। মোহনবাগান ফ্রি-কিক পেয়েছে। খেলা ভাঙতে মিনিট দশেক বাকি। ফ্রি-কিক নিতে শৈলেন মান্নার ডাক পড়ল। মহমেডান গোলে বাজপাখির নজরে দাঁড়িয়ে ইসমাইল। মান্নার সামনে ফ্রি-কিক আটকাতে মহমেডান প্লেয়াররা জবরদস্ত দেওয়াল তুলেছে। একবার শট নিলেন, কিন্তু প্লেয়ারের দেওয়ালে লেগে বল ফিরল। বাঁশি বাজানোর আগেই ওই ওয়াল থেকে ছিটকে একজন প্লেয়ার বাধা দিতে এসেছিলেন। রেফারি বাঁশি বাজালেন—রিকিক। দ্বিতীয় সুযোগে দেওয়ালের মধ্যে একজনের পায়ের ফাঁক

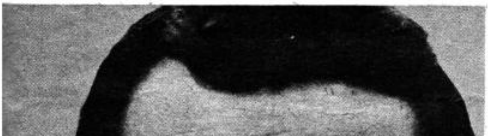

দিয়ে বলটা গলিয়ে দিলেন মান্না। চোখের পলকে দেখলেন, ইসমাইল মহমেডানের গোলের ভিতর থেকে বলটা কুড়িয়ে আনছেন। চারিদিকে কান ফাটা আওয়াজ। সেই এক ফ্রিকিকেই সে ম্যাচের ফয়সলা। এই তো সেদিন উনি রাইটার্সে এক গণ্যমান্য ব্যক্তির সংগে কথা বলছিলেন। মান্নাকে তিনি বলেন—উঃ আপনার সেই ১৯৪৪ লীগ খেলার ফ্রি-কিক আজও চোখে ভাসছে। জানেন সেই ম্যাচের পরে ময়দান থেকে প্রায় ডিগবাজি দিতে দিতে বাড়ি ফিরেছিলাম। মান্নাও স্মরণ করলেন সেই ম্যাচকে, "আমি সেদিন মাঠ থেকে ক্লাব টেনটে ফিরেছিলাম পুলিশের কাঁধে কাঁধে। সেদিনের স্মৃতি আজও বেশ জ্বলজ্বলে।"

সেই থেকেই শৈলেন মান্না স্পট কিক্ কিং। এটা কি ভোজবাজি? উনি ব্যাখ্যা দেন, "কক্ষনো নয়। আমি মানি এরকম অব্যর্থ ফ্রি-কিক নেওয়ার সময় প্রতিরোধের দেওয়ালে একটা-না-একটা ফাটল থাকবেই। ফাটলটা কোথায়, সেটাই চট্ করে, অবলীলায় বারবার আবিষ্কার করেছি। তখন চালু ছিল লেসওয়ালা বল। কিক্ করার সময় বলের লেসের দিকটাকে গোল-মুখো রাখতাম। ডান-পায়ের চেটোর ডানদিক দিয়ে এমনভাবে বলটা মারতাম যে, বলটা সোজা গিয়েই বাঁ-দিকে বাঁক ধরত। বলটাকে ঠিক মত জায়গায় মারার ব্যাপারটা আমার জন্মগত গুণ।"

কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে, এই শৈলেন মান্না ১৯৪৮ লনডন অলিম্পিকে ফ্রানসের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস্ করেছিলেন। ভারতীয় টিমে মহাবীর প্রসাদও সে-ম্যাচে আর-একটি পেনাল্টি ফসকেছেন। সেই মিস-ফায়ার সম্পর্কে মান্নার বক্তব্য, "আমি আমার প্রয়োজন-মত লেসের দিকটা গোলমুখো করে দিই। ফরাসী গোলকীপার সেটা দেখতে পেয়ে আবার আমার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। অগত্যা আমি সেটা আকাশ-মুখো করলাম। পেনাল্টি স্পটে বেশ কিছুটা গর্ত ছিল। বেশী সন্তর্পণে মারতে গিয়ে বলের নীচে শট্ করি। বলটা বেলুন হয়ে বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। একটু খেয়াল করলে হয়তো এরকম আফসোসের কাণ্ড ঘটত না।"

সেবার বিদেশ-সফরে বুটপরা প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে খালি-পায়ে ভারতীয় ফুটবলারদের খেলতে দেখে সবাই থ বনেছে। সকলেই ভ্রূ কুঁচকেছে। ইংল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের কাছে ভারতীয় প্লেয়ারদের হাজির করা হলে তাঁরাও আগ্রহ নিয়ে পরখ করেন ভারতীয় প্লেয়ারদের পায়ে সম্ভবত কোনও জাদু আছে। এই জমায়েতে সকলেরই নজর ছিল শৈলেন মান্নার প্রতি। এই প্লেয়ারটি কোন্ ভেলকিতে বলে এত জোরে লাথি মারে! মজার ঘটনা ঘটে চেলসী আর টটেনহ্যাম হসপারের খেলার সময়। ভারতীয় ফুটবলাররাও ছিলেন সে-ম্যাচের দর্শক। টটেনহ্যামের কয়েকজন কর্মকর্তা ভারতীয় প্লেয়ারদের পাশে ভিড় জমান। ভাব জমিয়ে তাঁরা মান্নার পা টিপে টিপে দেখে মাথা নেড়ে বলেন—"সফট।" পরিহাসচ্ছলে শৈলেন মান্না বলেন, "মহাশয়, আপনারা ভেবেছেন পা-টা বোধহয় কোনও লোহা অথবা কাঠ দিয়ে তৈরী?"

ফুটবলারের কাছে তার পা-ই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। লনডন অলিম্পিক থেকে ফিরেই শৈলেন মান্না ডান-হাঁটুতে চোট পান। মোহনবাগান টিমে তাঁর পক্ষে নিয়মিত খেলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষ টিমের খেলোয়াড়-জোগাড় মহলও তৎপর হয়েছে। তখনও সেই জখমী-হাঁটু মান্নার দাম অনেক। ও'র কাছে টোপ ফেলা হল। তিনি যা চান, তাই পাবেন। শিবির পাল্টালেই সব পাকা। উনি কিন্তু অনড়। প্রতিপক্ষ-

টিমের কর্মকর্তাদের সাফ জানিয়ে দেন, "আমি খোঁড়া পা নিয়ে বরং মোহনবাগান গ্যালারিতেই বসে থাকব, অন্য ক্লাবে যাওয়া সম্ভব নয়।"

মোহনবাগানও মান্নার মতন ফুটবল-রত্নকে হারায়নি। খেলতে-খেলতে এই অসাধারণ প্লেয়ারটির দুই হাঁটুই জখম হয়েছে। গোড়ালিতে চোট লেগেছে। মনে পড়ে, সতের বছর আগের মোহনবাগান ব্যাকলাইনে দুই-হাঁটুতে নী-ক্যাপের-গহনা-পরা শৈলেন মান্নাকে। কত ঝানু ফরোয়ার্ড মোহনবাগান গোলমুখে বল নিয়ে গিয়েই দিশাহারা হত। ফরোয়ার্ডটির কলাকৌশল যেন শৈলেন মান্নার কাছে বন্ধক রয়েছে। সমর্থকরা চোখ বুজেছে, এই বুঝি গোল খেল মোহনবাগান। অসম্ভব, মান্না উচিত-সময়ে ফরোয়ার্ডটির কারসাজির সব ধান্ধা পলকে শুষে নিয়ে ছোবল মেরে বল কেড়ে নিয়েছেন।

সেটা ছিল উনিশ বছর আগের লীগের বাঙাল-ঘটির লড়াই। ইস্টবেঙ্গলের সে-ম্যাচে জেতার কথা। সনৎ শেঠ ইস্টবেঙ্গলের গোল আগলাচ্ছেন। ম্যাচটার বেশির ভাগ সময়ই ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড বাহিনী মোহনবাগান-গোলের চৌকাঠে দাপিয়ে বেড়াল। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান পেল একটি মাত্র ফ্রি-কিক। কঠিন প্রাচীর উঠল। মান্না শট নিলেন। সনৎ শেঠ জায়গা বুঝে ডান-দিকের পোস্ট ঘেঁষে মোতায়েন। দেখলাম, নিমেষের মধ্যে সনৎ শেঠের চোখে ধুলো দিয়ে বাঁ দিকের পোস্টকে ঠোক্কর মেরে বল হুশ্ করে জালের ঘরে আশ্রয় নিল। সেই স্পট-কিকের ভঙ্গিও ছিল নিখুঁত। পা বলে আঘাত করার সময় তাঁর চোখ ও ডান হাঁটু ছিল ঠিক বলের উপরে। বাঁ পা বল থেকে সমান্তরালভাবে এক ফুট দূরে। মনে হয়, মান্নার পায়ে যেন কম্পাস লাগান থাকত।

সহস্র উত্তেজনা সত্ত্বেও শৈলেন মান্নার মাঠের ব্যবহারে কিন্তু কোনওদিন কলঙ্কের ছাপ পড়েনি। এমনকী রেফারি ভুলচুক করলেও ওঁর মেজাজে তীব্রিক্ষেভাব দেখা যায়নি। খোদ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ওঁর বিচক্ষণতায় টোল পড়েনি। ১৯৫৬ লীগ ফুটবল মোহনবাগানের ২—১ গোলে বিজয়ের ঘটনাটা দর্শকমনে হয়তো আবছা হয়ে থাকতে পারে। সে ম্যাচের রেফারির পক্ষে ওই ম্যাচ চিরদিন মনে থাকাই স্বাভাবিক। মোহনবাগান টিমের প্লেয়ারের দোষে রেফারি মোহনবাগান গোলের সামনে ইনডিরেক্ট কিকের নির্দেশ দেন। শৈলেন মান্না কিক নেওয়ার আগে রেফারির কাছ থেকে এ বিষয়ে ভালভাবে জেনে নেন যে, এটা ইনডিরেক্ট কিক। গোলকীপার এস চ্যাটার্জিকে সেজন্য মান্না বলেন তিনি যেন বল না ধরেন। ওই কিক থেকে মোহনবাগানের কোনও প্লেয়ারকে না ছুঁয়েই বল গোলে ঢোকে। শৈলেন মান্না অবাক—রেফারী গোলের বাঁশি বাজিয়ে দেন। পরিস্থিতিকে শান্ত রাখবার জন্য মান্না কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তই মেনে নেন। মোহনবাগান সে-ম্যাচ জেতে ২—১ গোলে।

যে-কোন মোহনবাগান প্লেয়ারের মনে ইসটবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশটাই জ্বলজ্বলে হয়ে জমে থাকে। ওই গ্রেট ফুটবলারের কাছেও বহু টিমের ফরোয়ার্ড লাইনের চেয়ে ইসটবেঙ্গলের বিখ্যাত ফরোয়ার্ড পঞ্চক—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালের বোঝাপড়াটাই স্মরণীয় হয়ে আছে। ওই পাঁচজন ফরোয়ার্ডের বিশেষ গুণগুলো ওঁর মনে এখনও ঝিলিক দেয়। যেমন ভেঙ্কটেশ—ধুরন্ধর ড্রিবলার ও বল-প্লেয়ার। আপ্পারাও—দারুণ ড্রিবলার ও ফিডার। ধনরাজ—প্রচণ্ড খাটিয়ে, সুযোগসন্ধানী ফরোয়ার্ড। আমেদ খাঁ—ফরোয়ার্ড লাইনের কনট্রোল টাওয়ার। সালে—আমেদ খাঁর যোগ্য সতীর্থ খেলোয়াড়।

বহু গোলকীপার এস মান্নার শট রুখতে গিয়ে বিষম খেয়েছে, চোট পেয়েছে। ভবানীপুরের খেলার সময় গোলকীপার ইসমাইল তো ওঁর শট রুখতে গিয়ে আঙুলই ভেঙে ফেলেন। রাজস্থান ক্লাবের মনে থাকবে হয়তো, আই এফ এ শীলড তাদের হাতে এসেও ফসকে গিয়েছিল ওই ফ্রি-কিক স্পেশালিস্টের শটের ধমকে। সেটা ছিল ১৯৫২ শীল্ড ফাইনাল। প্রথম সাক্ষাৎকারের হাফ-টাইম পর্যন্ত তারা জিতছিল ২—০ গোলে। হাফ-টাইমের পরে ৪০ গজ দূর থেকে মান্নার এক গোলার মত ফ্রি-কিকের কল্যাণে মোহনবাগান খেলা ১—২এ দাঁড় করায়। সেই প্রেরণাতেই বকেয়া-গোলও ঢুকিয়ে ফেলে।

খেলোয়াড় হিসাবে মান্না জোর গলায় স্বীকার করেন "আমার খেলার যা কিছু ঋণ শরৎ দাসের কাছে। সে ঋণ কখনও শোধ হবে না। কিন্তু শীল্ড ফাইনালে হারাধনদার চার গোল খাওয়ায় মোহনবাগান-সমর্থক হিসাবে যে দিব্যি গেলেছিলেন, তার কী হল? আশ্চর্য উনি সে পাওনাও চুকিয়ে দিয়েছেন। ১৯৫৬ শীল্ড ফাইনালে এরিয়ানকে চার গোলে হারিয়ে। মান্নার কাছে এ-ম্যাচটা বহু বিখ্যাত ম্যাচের পাশে আলাদা কদর পেয়েছে।

শৈলেন মান্না সর্বদাই হুঁশিয়ার ছিলেন—মোহনবাগান টিমের প্রতীক পালতোলা নৌকোটি যেন বিপর্যয়ের চরায় না আটকায়। এজন্যে কত গ্যালন ঘাম ঝরিয়েছেন, তা কেই বা জানে? নিজের খেলার বাঁধুনি মজবুত রাখতে দারুণ ধরাবাঁধা জীবন যাপন করেছেন, রাত্রে তাড়াতাড়ি শোয়া, খেলার দিনে ভাত না-খাওয়া, দুপুরে না-ঘুমানো এবং কম কথা বলা, সবকিছুই একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত মেনেছেন। এতসব নিয়মনীতির পুরস্কারও পেয়েছেন অঢেল। শুধু মোহনবাগান অথবা বাংলা টিমই নয়, পঞ্চাশের দশকের অর্ধেক জুড়ে ভারতীয় দল মাঠে নেমেছে শৈলেন মান্নার অধিনায়কত্বে। ওঁর আমলে ভারত তিনবার কোয়াড্রাঙ্গুলার জেতার সম্মান পেয়েছে, এশিয়ার সেরা ফুটবল টিম হয়েছে এবং অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল-টিম যোগ দিয়েছে। শৈলেন মান্না তখন যেন যশের পাহাড়ের চূড়ায় দাপটে পায়চারি করেছেন। পনের বছর আগে স্বেচ্ছায় মাঠ থেকে ছুটি নেন। ফুটবলকে অবশ্য তিনি ছাড়তে পারেন নি। বরং আরও গুরু দায়িত্বে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।

খেলোয়াড়-জীবনের অভ্যাসগুলো এখনও ওঁর বন্ধু। এখনো ভোরে ওঠেন, সপ্তাহে একদিন ভাত খান, রোজই টুকিটাকি ব্যায়াম করেন। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা শৈলেন মান্না জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, ভাল ছেলে পেলে ভাল ফুটবলার তৈরি করবেন। শৈলেন মান্না এখনও, এমন কী, অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের কাছেও স্বপ্নের ফুটবলার এস মান্না। সেখানে একবার হাজির হলে চেনা অচেনা সব বয়সী দর্শক আজও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, ফুলের মালায় বরণ করেন। ওই ভিড়ে চেনা শক্ত, কে ইস্টবেঙ্গল আর কে মোহনবাগানের অনুরাগী।

ছবি এঁকেছে ঋতম্‌ দাশগুপ্ত (বয়স ৬)

ভুবনেশ্বর থেকে পুরী

বড়দিনের ছুটিতে আমরা সবাই মিলে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলুম। ওরই মধ্যে একদিন ভুবনেশ্বর গেলুম। সেখানে বাবার এক বন্ধুর বাড়ি। তাঁদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেয়ে, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, ধবলগিরি —এইসব দেখে, আর গোটা শহরটায় একবার চোখ বুলিয়ে যখন "ক্যালকাটা টু পুরী" বাসে উঠলুম তখন সন্ধ্যে সাতটা।

বাসে উঠেই ড্রাইভারের পাশের সিটদুটো বাবা আর আমি দখল করলুম। সিগারেট কিনবার জন্য বাবা কনডাকটরকে মিনিট পাঁচেকের জন্য বাস থামাতে বললেন। কনডাকটর বলল, 'কুছ পরোয়া নেই।' বলে সে নিজের থেকে বাবাকে একটা সিগারেট দিলো। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য যে মিনিট পনের অন্তর অন্তর সে বাবাকে একটা করে সিগারেট দিয়েই যেতে লাগলো।

বাস তো এদিকে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার চিরে আমাদের বাস ছুটছে। কাচের জানালায় চোখ রেখে বাসের আলোতে বাইরেটা দেখতে পাচ্ছিলুম স্পষ্ট। রাস্তায় একটা জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না, মাঝে মাঝে দু-একটা শিয়াল হর্নের শব্দে এক দিক থেকে অন্য দিকে ছুটে চলে গেল। আর অনেক দূরে দূরে ব্যবধানে দুদিকের গাছপালার মধ্যে জনা পাঁচেক লোক একত্র হয়ে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আগুনে পোহাচ্ছে আর গান গাইছে।

মাঝে মাঝে দু-একজন লোক রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে গেল। তাদের আপাদমস্তক সাদা চাদর দিয়ে মোড়া। অনেকের সঙ্গে থলে; হয়তো কাছাকাছি কোনো হাট থেকে জিনিসপত্তর কিনে বাড়ি ফিরছে।

সাক্ষীগোপাল, পিপলী, সব পিছনে পড়ে রইল। আরও বেশ কিছুক্ষণ ছুটে চেকগেটের সামনে গিয়ে বাস থামলো। সেখানে একজন লোক বাসে উঠে বাসের লোকসংখ্যা গুনলো আর মাথাপিছু বার পয়সা নিয়ে নেমে গেলো। তখন বাসে একটা অন্ধ ভিখিরি উঠেছিল। চেকগেটের কাছে মোটামুটি আলো। সামনে দু-চারটে চা-পান কি খই-বাতাসার দোকান। দোকানে টিমটিমে বাতি জ্বলছে। এখানে দু-দিকের বন একটু পাতলা।

খানিক বাদে খেয়াল হলো বাস আবার ছুটছে: দুদিকের গাছপালা মোটেই হাল্কা নয়, বেশ বন; আর পথে একটি জনপ্রাণীও নেই। চারদিকের গাছগুলোকে 'ভূতুড়ে গাছ' বলে মনে হচ্ছিল। ডালপালাগুলো এমন বিঁতকিচ্ছিরি ভাবে ছড়ানো ছিটানো যে দেখে মনে হয় কতকগুলো পেত্নী হাত-পা মেলে নাচছে।

ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আসছিল। তবুও, ঘুমুলে কতকিছু দেখতে পাব না,— এই ভেবে চোখ টানটান করে রেখেছিলুম।

শীতে বাইরে কুয়াশা জমেছে। দুদিকে ভূতুড়ে গাছের ঘন বন। মধ্যিখানের কালো পিচ্ ঢালা রাস্তা দিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুরী শহরে পৌঁছেবো।

শিউলি চক্রবর্তী (বয়স—১৪)

ভালো লাগে

কাঁচা মিঠে আম মোর
লাগে ভারি মিঠে,
ঠিক যেন মোর মিষ্টি মায়ের
হাতে গড়া পিঠে।
ভারি ভালো লাগে মোর
পাকা পাকা কুল,
আরও ভালো লাগে ভাই
না পাকা তেঁতুল।
যত পাই তত খাই
কুল ও তেঁতুল,
গন্ধেতে ভালো লাগে
গোলাপ, চাঁপা ফুল।
আকাশেতে ভালো লাগে
সাদা হাঁস দল,
মাঠ ভরা ঘাস আর
দীঘি ভরা জল।
ছোট ছোট পাখিদের
গানের আসর,
(কিন্তু) মোর সব থেকে ভালো লাগে
মায়ের আদর॥

অনুরাধা মজুমদার (বয়স—১১)

পিকনিক

ফিস্টি করতে ডায়মণ্ড হারবার
নিয়ে ইয়া বড় লিস্টি
পথে যেতেই ফুরিয়ে গেল
দুই তিন হাঁড়ি মিষ্টি
খেতে না খেতেই মেঘ কালো করে
নামল ভীষণ বৃষ্টি
ফিস্টি না করে ফিরলাম শেষে
দু চোখে করুণ দৃষ্টি।

মিঠু দেব, (বয়স—১১)

আমার ভাণ্ডার

জানিস আমার ভাণ্ডারে,
আছে অনেক মণ্ডা রে—
সেই মণ্ডা খেয়ে আমার
লাগল ভীষণ ঠাণ্ডা রে:
আরও আছে ভাণ্ডারে,
অনেক অনেক আণ্ডা রে—
সেই আণ্ডা খেয়ে আমি
হলাম দলের পাণ্ডা রে।

অনিন্দ্য লাহিড়ী
(বয়স—৮)

সিংহ মহাশয়

শিকারীর থেকে বন্দুক নিয়ে
দেখিয়ে দেব ভয়।
তখন তুমি ঠিকই পাবে
আমার পরিচয়।
ওহে সিংহ মহাশয়।

চিত্রলেখা বসু (বয়স—৮)

থিসিউস

উমা দাশগুপ্ত

গ্রীক নায়ক থিসিউসের ছিল ছোটবেলা থেকেই এক দুঃসাহসী মেজাজ। তিনি এথেন্সের রাজার ছেলে। কিন্তু এই জরুরী কথাটি প্রথমে তিনি জানতেন না।

থিসিউসের জন্ম হয়েছিল যখন তাঁর বাবা ইজিউস রাজ্য ছেড়ে কিছুদিনের জন্য ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে এক আশ্চর্য সুন্দরী রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি হচ্ছেন রাজকুমারী ইথ্‌রা। রাজা ইজিউস তাঁকে বিয়ে করলেন। কিন্তু তিনি যে এথেন্সের রাজা, সে-কথা রাজকুমারীকে জানালেন না। এই ইথ্‌রা এবং ইজিউসের পুত্রই থিসিউস।

কিছুদিন ভ্রমণের পর ইজিউসের মন আবার দেশের দিকে ফিরল। কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে এথেন্সে না নেওয়াই ঠিক করলেন। যাবার আগে ইথরাকে এক নির্জন পাহাড়ে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন। চার দিকে পাথর-কাটা উঁচু উঁচু পাহাড়। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটি নদীর স্রোত। সেই নদীর গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক মস্ত শেওলাপড়া পাথর। বহু আগে হয়ত কোনো একটা ভূমিকম্পের ফলে ওই পাথর উপর থেকে ছিট্‌কে নীচে চলে এসেছিল। ওই স্থানে ইথরাকে নিয়ে গিয়ে ইজিউস বলেন যে, অনেক দূরের পথে এবারে তাঁকে চলে যেতে হবে। ও'দের হয়ত এই শেষ দেখা। কিন্তু থিসিউস যখন বড় হবে তখন ইথ্‌রাকে একটা কাজ করতে হবে। তাকেও ওইখানে ওই শেওলা-পড়া পাথরের কাছে ইথ্‌রার নিয়ে আসতে হবে। এমন একটা সময়ে নিয়ে আসতে হবে, যখন আশেপাশে আর কেউ থাকবে না। শুধু ও'রা দুজন। থিসিউসের ওই পাথরটিকে গড়িয়ে দিতে হবে। যদি সে তা না পারে তাহলে ওই পাথরটি ওইভাবেই থাকবে। কিন্তু যদি সে ওটি গড়িয়ে দিতে পারে তাহলে পাথরের তলে রাখা জিনিসগুলি যেন থিসিউস তুলে নেয়। তুলে নিয়ে ভাল করে দেখে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে ইজিউস লুকিয়ে চলে যান। ইথ্‌রা খুব কষ্টে পড়েন। তাঁর মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শিশু থিসিউসের কথা ভেবে তিনি তার দিকে মন দেন। আস্তে আস্তে থিসিউস বড় হয় এবং মাকে খুব ভালবাসে। তার গায়ে খুব জোর। সকলের সঙ্গে সে ঝগড়া করে বেড়াত, শুধু তার মার সাথে ছাড়া। কিছুকে সে ভয় করত না। দূরে দূরে গিয়ে মায়ের জন্য পাখি শিকার করে আনত, একবার একটা ছোট হরিণও শিকার করে এনেছিল। হরিণটি প্রায় তার সমান। এ-সব দেখে ইথ্‌রার মনে আশা জাগল যে, কোনো একদিন ওই বিরাট পাথরটি নিশ্চয়ই থিসিউস সরাতে পারবে। তখনও তিনি ওকে ওটির কথা জানতে দেননি। শুধু মাঝে মাঝে তাকে দিয়ে বনের পথে বা সমুদ্রের ধারে ভারী ভারী পাথর তোলাতেন।

থিসিউসের যখন পনরো বছর বয়স, তখন সে তার বাবার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করত। ইথ্‌রা তাকে বলতেন যে, বহুদিন আগে ইজিউস চলে যান। তারপরে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। পাথরটির কথা তখনও বলতেন না। ভয় পেতেন, ওই পাথরটিকে সরাতে পারলেই তো থিসিউসও নিশ্চয় তার মাকে ছেড়ে বাবার খোঁজে চলে যাবে। কিন্তু থিসিউসের বয়স যখন উনিশ হল, তখন সে স্থির করল যে, ভ্রমণ করতে যাবে। তার মাকে জানাল যে, তার বাবার খোঁজে সে সারা গ্রীসদেশ ঘুরবে, প্রয়োজন হলে সারা পৃথিবীও। এ কথা শুনে স্বামীর আদেশ মনে রেখে ইথ্‌রা ছেলেকে সেই পাহাড়ে নদীর ধারের পাথরটির কাছে নিয়ে গেলেন। নদীর কাছে ঘাসের উপর বসে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। থিসিউসের মনে হল, তার বাবা যদি ওই পাথরটি নড়িয়ে তার তলে উপহার রেখে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেও একদিন ঐ পাথর সরাতে পারবেই পারবে।

প্রথমবার কিন্তু থিসিউস তা পারেনি। পাথরটিকে এক চুলও সেবার গড়াতে পারেনি। তার মা তাতে খুশীই হলেন। ভাবলেন যাক, ছেলেকে তাহলে আরও কিছুদিন কাছে রাখতে পারবেন। কিন্তু তা হল না। যেদিন বিফল হয়েছিলেন, তার পরের দিন ভোরেই থিসিউস নতুন করে চেষ্টা শুরু করেন। সেবারে প্রথম চেষ্টায় পাথরটিকে একটু নড়াতে পারেন। তার পরপরই আরেকবার চেষ্টার ফলে পাথরটিকে মাটির থেকে একটু সরাতে পারেন। তারপর তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটিকে শেষ পর্যন্ত গড়িয়েও দিতে পারেন। পাথরের তলায় বেগুনী কাপড়ে জড়ানো একটা জিনিস পড়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই থিসিউস কাপড়টি ছিঁড়ে ফেললেন। বেগুনী কাপড়ের তলে দেখা গেল সাদা কাপড়ের একটি মোড়ক। তার মধ্যে পাওয়া গেল একজোড়া অপূর্ব জুতো। সোনালী সুতোয় সেলাই করা জুতো। সঙ্গে একটি ঝক্‌মকে তলোয়ার। অমন জুতো শুধু রাজারাই পরেন। তলোয়ারের হাতলটি সোনায় বাঁধানো। দেখেই বোঝা গেল, ওটি রাজার তলোয়ার। থিসিউস অনেক যত্নে ওটি পরীক্ষা করলেন। দেখলেন তলোয়ারে লেখা রয়েছে 'এথেন্সের রাজা ইজিউসের তলোয়ার'। থিসিউস এবারে গোপন কথাটি বুঝতে পারলেন। তাঁর বাবা তাহলে এথেন্সের রাজা ইজিউস। বাবার সম্পর্কে অনেক দুঃখের কথা তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল। ইজিউসের ভ্রমণকালে তাঁর ভাই প্যালাস এবং তাঁর কুপুত্রেরা রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল। ইজিউস সবসময় তাদের ভয়ে থাকতেন। এখন থিসিউসের মনে হল, একমাত্র তিনিই তার

বাবাকে ওই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারবেন। সেই জুতো পরে এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

পথে অনেক দৈত্যদানবকে হত্যা করে অবশেষে থিসিউস এথেন্স এসে পৌঁছন। রাজা তাঁকে দেখে ভারী খুশী হলেন, কারণ ভাই এবং ভাইপোদের অত্যাচারে তিনি খুব দুরবস্থায় ছিলেন। তিনি প্যালাসের ছেলেদের সামনে থিসিউসকে দাঁড় করালেন। বললেন, "এই আমার পুত্র দৈত্যহন্তা থিসিউস। ও হবে এই বাড়ির কর্তা।" তারা তো শুনে রেগে আগুন। ভাবতে শুরু করল, কীভাবে থিসিউসকে হটানো যায়। শুরু করল ষড়যন্ত্র। থিসিউস অবশ্য সব টের পেয়ে যান; তাঁর বাবার কয়েকটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে তিনি তাঁর দুষ্টু ভাইদের মেরে ফেলেন। এথেন্সের মানুষেরা এতে যারপরনাই খুশী হল।

কিন্তু ক্রমেই থিসিউস দেখলেন যে, রাজ্যের মানুষগুলি কেমন যেন ভীত, কেমন যেন অসুখী। মাঝে মাঝে মাথা গুনলে দেখা যায় যে, শহরের লোক কমে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে থিসিউসকে বলা হত, যে-সব লোককে দেখা যাচ্ছে না, তারা অনেক দূরে চলে গেছে। মাঝে মাঝে আবার থিসিউস লক্ষ্য করতেন, মানুষজন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কিসের অপেক্ষায় যেন রয়েছে। রাজা ইজিউস নিজেও যেন কিসের জন্যে একটু ভয়ে-ভয়ে থাকতেন। ব্যাপার কী, শেষ পর্যন্ত থিসিউস তা জানতে পেরেছিলেন। অনেক দুঃখের কথা।

কয়েক বছর আগে প্যালাসের সেই কুপুত্রেরা ক্রীটের রাজকুমারকে মেরে ফেলেছিল। ক্রীটের রাজা মিনস, তাঁরই ছেলেকে। ছেলেটি এথেন্সে এসেছিল একটা খেলার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। বহু খেলায় সে জিতেছিল, বহু সম্মান পেয়েছিল। সবের শেষে সে রাজভোজনে বসেছিল। এই সময় হঠাৎ সে খুন হয়। রাজা মিনস সে খবর পাওয়ামাত্র এথেন্স ধ্বংস করে ফেলবেন ঠিক করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে অনেক জাহাজ নিয়ে এসে হানাও দিয়েছিলেন। ঠিক করেছিলেন, এথেন্সের প্রতিটি পুরুষকে মেরে ফেলবেন আর সব মহিলা ও শিশুকে বন্দী করে রাখবেন তাঁর দেশে। এই অবস্থায় মিনসের কাছে ইজিউস দয়া ভিক্ষা করেন। দেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার জনাই এই প্রার্থনা। মিনস তাতে রাজী হলেন। কিন্তু একটা শর্তে। প্যালাসের পুত্রদের তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। সেটা অবশ্য তখন আর সম্ভব নয়, কারণ তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সুতরাং মিনসের শাস্তি ইজিউসকে মেনে নিতে হল। মিনস শাস্তিটা অবশ্য কিছু কমিয়ে দিলেন। এথেন্সের রাজ্য তিনি ছুঁলেন না। শুধু বলে গেলেন যে, প্রতি নয় বছর পরে তিনি এথেন্সে জাহাজ পাঠাবেন। সেই জাহাজ করে এথেন্সের সাতটি সব চাইতে সুন্দরী মেয়েকে ক্রীটে পাঠিয়ে দিতে হবে। লটারি করে এদের বাছা হবে। এরা আর কোনোদিন ফিরবে না। ক্রীটে পৌঁছবার পরে এঁদের পাহাড়-কাটা এক গুহায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত। সেই গুহায় ছিল এক ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধা। আর গোলকধাঁধার মধ্যে আশ্চর্য এক দানব বাস করত। তাকে সকলে মিনটর বলত। মিনটরের ছিল মানুষের গা, ষাঁড়ের মাথা, আর সিংহের দাঁত। যাদেরই সে পেত, খেয়ে ফেলত। বাকিরা অলিগলিতে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মারা যেত।

এই জাহাজের জনাই এথেন্সের মানুষ আতঙ্কে অপেক্ষা করে থাকত। থিসিউস তাদেরই দেখতে পেয়েছিলেন। সব কথা শুনে তিনি জাহাজটি পুড়িয়ে ফেলবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সবাই তাঁকে বললেন যে, তাতে লাভ নেই। মিনস আবার অন্য জাহাজ পাঠাবেন। তখন থিসিউস ঠিক করলেন, এবারই তাহলে শেষ বারের মত লোক পাঠানো হবে। আগামী নয় বছরের মধ্যে এথেন্স এক বিশাল সৈন্যদল তৈরী করে ফেলবে। তাই দিয়ে মিনসের দলকে হারিয়ে দেবে। এবারের মত থিসিউস ঠিক করলেন, তিনি নিজেই ওই সাতজনের একজন হয়ে জাহাজ করে ক্রীটে যাবেন। মিনটরকে তিনি একাই শেষ করবেন।

থিসিউস তা-ই গেলেন। ক্রীটে পৌঁছে প্রথমেই মিনসের কাছে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য সকল গ্রীক বন্দীদের আগে তিনি একা মিনটরের দর্শন পেতে পারেন কি না। মিনস যখন জানলেন এই ব্যক্তি থিসিউস তখন খুবই খুশী হলেন। ভাবলেন এইবার তাঁর সত্যিকারের প্রতিশোধের পালা। মিনটরের সামনে থিসিউসকে এগিয়ে দিলেন তিনি। এই একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, থিসিউসের এই শেষ। কিন্তু থিসিউসের সাহায্যে একজন এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি হলেন মিনসের মেয়ে আরিয়াড্নে। এক পলক দেখেই আরিয়াড্নে থিসিউসকে ভালবেসেছিলেন। তিনি গোপনে থিসিউসকে একটা তলোয়ার দিলেন, এবং একটি উলের বল। একমাত্র ওই তলোয়ারটির আঘাতেই মিনটর জখম হবে, অন্য কিছুতে হবে না। আর সবশেষে ওই গুহার আঁকাবাঁকা পথ চিনে থিসিউস যাতে বেরোতে পারেন, তারই জন্য ওই উলের বল। গুহায় ঢুকবার মুখে উলের বলের আগাটুকু থিসিউস একটি পাথরে বেঁধে দেবেন, তারপর সেই উলই তাঁকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবে।

সবই ঠিক মত হল। মিনটর বধ হলো, থিসিউস অক্ষত দেহে, সুস্থ মনে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এত ক্ষমতা সত্ত্বেও থিসিউসের জীবন সবটুকু সুখের হল না। আনন্দে আরিয়াড্নে তাঁর সাথে এথেন্সে চললেন। কিন্তু পথে থিসিউস স্বপ্নে দেখলেন যে আরিয়াড্নে কোনো মানুষের স্ত্রী হতে পারেন না, দেবতার স্ত্রী হতে হবে তাঁকে। সুন্দর একটি দ্বীপে তাই আরিয়াড্নেকে থিসিউস রেখে এলেন। ঘুমন্ত অবস্থায়। আরিয়াড্নে হলেন দেবতা ডাইওনিসাসের দেবী। থিসিউস তারপর আবার এথেন্সের পথে পাড়ি দিলেন। তাঁর বাবাকে তিনি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন যে, যদি তিনি বেঁচে ফেরেন, তা হলে জাহাজে সাদা পাল উড়িয়ে ফিরবেন। যাবার সময় কালো পাল তোলা ছিল। কিন্তু আরিয়াড্নেকে ছেড়ে আসার দুঃখে থিসিউস সে-কথা ভুলে যান। বৃদ্ধ পিতা ইজিউস দূরে থেকে দেখলেন, কালো পাল তোলা জাহাজ ফিরছে। ভাবলেন থিসিউস মৃত। দুঃখে তখনই তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আজও তাই সেই সমুদ্রের নাম ইজিয়ান সমুদ্র। থিসিউস নেমেই সেই খবর পেলেন। তিনি ভাল রাজা হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই ভুলে যে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল, সেই দুঃখ তাঁর ঘোচেনি।

ANANDAMELA Regd. No. WB/CC 254

বিষেণ সিং বেদী
আলোকচিত্র
নিখিল ভট্টাচার্য